সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ০৬ মে ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৩১-৩২

www.weeklyarafat.com

বড়ো সোনা মসজিদ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৩১-৩২
* বার : সোমবার

◈ ০৬ মে-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২৩ বৈশাখ- ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ২৬ শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬
সহযোগী সম্পাদক : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
বিপণন অফিসার : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
কম্পিউটার বিভাগ : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
টেলিফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **কা‘বা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তার উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালনকারী নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **বৃষ্টির দিনের আযান : একটি মৃত সুন্নাত**
    আব্দুর্ রউফ- ১৩
- **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক**
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী
    প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক- ১৫
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **তামিম দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ১৮
- **বিশেষ মাসায়িল** ২১
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা**
    সাইফুল্লাহ ত্রিশালী- ২৪
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **এক দিকে মানবতা অন্যদিকে বর্বরতা**
    মো. কায়ছার আলী- ২৬
- **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **বারবার প্রশ্ন তারপরে...**
    মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২৮
- **আলোকিত ভুবন :**
  - ❖ **স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে ‘বিশ্ব বই দিবস’-এর গুরুত্ব**
    এম এ মতিন- ৩১
- **শুব্বান সংবাদ** ৩৭
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৯
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে বিপর্যয় : পরিত্রাণ কীভাবে

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। এই ছয়টি ঋতু আমাদের প্রকৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যময়, করেছে অপরূপ সাজে সুসজ্জিত। যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অপরিমেয় নিয়ামত। কিন্তু সময়ের পালাবদলে সেই ঋতুবৈচিত্র্যতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে! ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিতে ঘটছে নানা বিপর্যয়। বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়-ভূমিকম্প নানা ধরনের বিভ্রাট। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, কেন প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটছে? এজন্য কে দায়ী? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জলে ও স্থলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা মানুষের নিজহস্তের অর্জন। অর্থাৎ- মানুষ নিজেই আপন পায়ে কুড়াল মারছে!

পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, প্রকৃতিতে বিপর্যয়ের মূল কারণ হলো জলবায়ুর অনভিপ্রেত পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশের বৈরিতা। তারা পরিবেশের এই বৈরী ভাবের জন্য দায়ী করেন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাবকে। প্রশ্ন হলো– পৃথিবীর উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে? –এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউস গ্যাসের ইফেক্ট ও ঊর্ধ্বাকাশে ওজোনস্তরের ঘনত্ব কমে যাওয়া। এ জন্য বিজ্ঞান দায়ী করছে, আঠারো শতকের শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষের ব্যবহার্য নানা যন্ত্রপাতি ও কলকারখানাগুলোকে।

শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত জীবাশ্ম-জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে বাতাসে মিশছে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের বার্ষিক গড় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১০ পিপিএম, ১৮৬৬ পিপিবি ও ৩৩২ পিপিবি। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আশঙ্কাজনক বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ঠিক এই কারণেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হচ্ছে, যা পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে মানুষের স্বহস্তের কামাই। এক কথায় বলা যায়, মানুষের তৈরি করা প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ কারণেই প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।

উপর্যুক্ত বৈষয়িক কারণ ছাড়াও প্রকৃতিতে বিপর্যয়ের কিছু আধ্যাত্মিক কারণও রয়েছে, যা আমাদেরকে কুরআন ও হাদীস অবগত করেছে। আর তাহলো আমাদের পাপের প্রতিফল! যেন আমরা তাওবাহ্ করে প্রভুর পানে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। মানুষ যখন অতিমাত্রায় পাপে নিমজ্জিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করবে, তখন মানুষ নানা ধরনের আজাবের মধ্যে নিপতিত হবে। অর্থাৎ- মানুষ যখন অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি-রাহাজানি, নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি নিয়ে মত্ত থাকবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা আসমানী বালা– ভূমিকম্প, ভূমিধস, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রেরণ করে স্বীয় বান্দাকে সতর্ক করবেন। তবে এই আসমানী বালা থেকে উত্তরণের উপায়ও আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। তা হলো– প্রথমত আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করা। যারা আল্লাহ'র উপর তাওয়াক্কুল করে, তাদের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত বেশি বেশি তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করা। কেননা তাওবাহ্ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে একদিকে যেমন পাপ মোচন হয়, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা ইস্তিগফারকারীকে সন্তান-সন্ততি, ফল-ফসল, ধন-সম্পদও খাল-বিল, নদীনালা ও ঝরণাদি প্রবাহিত করে ভারসাম্যময় জীবন ধারায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীজগতকে সজীব, সতেজ ও জীবন্ত করেন। আর এসব নিয়ামতের মাধ্যমে প্রকৃতি ফিরে পায় তার সৌন্দর্য। ফলে আমরা ভোগ করতে পারি ষড়ঋতুর বৈচিত্রময় আমেজ।

তৃতীয়ত বেশি বেশি দান-সাদাক্বাহ্ করা। দান-সাদাক্বাহ্ একদিকে মানব জীবনকে সুরক্ষিত করে, অপরদিকে সমৃদ্ধিও দান করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মানুষ যখন যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন তারা মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত বৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়। তবে বিভিন্ন প্রাণীকূলের আর্তনাদের কারণে কখনো বৃষ্টি দেন। এ জন্য পরিবেশ ও প্রকৃতি বেঁচে থাকে। অতএব চূড়ান্ত বিপর্যয় আসার আগেই সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। আসুন! আমরা আমাদের পরিবেশ-প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে বৈষয়িকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করি! পাশাপাশি সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত থেকে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করি! তবেই আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ লাভে ধন্য হবো ইন্‌শা-আল্লাহ। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

কা'বা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তার উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

শাব্দিক অনুবাদ

اِنَّ অর্থ- নিশ্চয়, اَوَّلَ সর্বপ্রথম, بَيْتٍ ঘর, وُّضِعَ যাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, لِلنَّاسِ মানুষের জন্য, لَلَّذِيْ তা بِبَكَّةَ বাক্কাতে ('বাক্কা' এটি মক্কার আরো একটি নাম), مُبٰرَكًا বরকতময়, وَّ এবং, هُدًى পথ প্রদর্শক, لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীর জন্য, فِيْهِ তার মাঝে রয়েছে, اٰيٰتٌ নিদর্শন, بَيِّنٰتٌ সুস্পষ্ট, مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীম [আলাইহিস সালাম]-এর পায়ের ছাপ রয়েছে যে পথরে), وَ এবং, مَنْ যে, دَخَلَهٗ তাতে প্রবেশ করবে, كَانَ اٰمِنًا সে নিরাপত্তা লাভ করবে, وَ এবং, لِلّٰهِ আল্লাহর জন্য, عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর, حِجُّ হজ্জ (এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত যা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি), الْبَيْتِ ঐ ঘরের, مَنِ اسْتَطَاعَ যে সামর্থ্য রাখে, اِلَيْهِ سَبِيْلًا সেই পথের (ব্যয়ভার বহনে), وَ এবং, مَنْ যে, كَفَرَ অস্বীকার করে, فَاِنَّ অতঃপর নিশ্চয়, اللّٰهَ আল্লাহ, غَنِيٌّ ধনবান, عَنِ হতে/থেকে, الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজাহান।

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বরকতময় ও বিশ্ববাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক। তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন, মাক্বামে ইব্রাহীম। আর যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তার উপর অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।"[১]

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কা'বা ঘরের নির্মাণ ও তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে হজ্জের বিধান সম্পর্কে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ক্বিবলা পরিবর্তন করলেন তখন ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগ (বায়তুল মাকদিস তো প্রথম 'ইবাদতখানা, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাথীরা কেন তবে নিজেদের কিবলা পরিবর্তণ করে নিলো) খন্ডনে ও কা'বা গৃহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ মানুষকে হজ্জের বিধান দেওয়ার জন্য এ আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম এ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" এটিই সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম 'ইবাদতের জন্য নির্মিত স্থান। বিশ্বের সর্বপ্রথম 'ইবাদতঘর। ইতিপূর্বে কোনো উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। এ কারণে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। আলোচ্য আয়াতাংশে وُّضِعَ لِلنَّاسِ বলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সকল মানুষের সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

﴿لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "ঐ গৃহ যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৬-৯৭।*

পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে এর অপর নাম বাক্কা। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির স্কন্ধ এখানে ভেঙ্গে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মস্তক এখানে শুয়ে পড়ত বলে একে মক্কা বলা হয়। একে মক্কা বলার আরো একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীর জমেই থাকে। এর আরো একটি কারণ এই যে, এখানে মানুষ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এমনকি কখনো কখনো স্ত্রী লোকেরা সম্মুখে সালাত আদায় করতে থাকে এবং পুরুষ লোকেরা তাদের পিছনে হয়ে যায় যা অন্য কোনো জায়গায় হয় না। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : ফাজ্জ হতে তানঈম পর্যন্ত হচ্ছে মক্কা এবং বায়তুল্লাহ্ হতে বাতহা পর্যন্ত হচ্ছে বাক্কা। বায়তুল্লাহ্ এবং একে ঘিরে থাক মাসজিদকে বাক্কা বলা হয়েছে। আর অবশিষ্ট শহরকে মক্কা বলা হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার হারূরা বাজারে দাঁড়িয়ে বললেন : হে মক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হতো তবে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। এ মক্কাতেই রয়েছে মহান আল্লাহর ঘর কা'বা। যা বরকতময় ও কল্যাণের আধার এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।

﴿فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ﴾

অর্থাৎ- "এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এই নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাকাম-ই-ইব্রাহীম।" যা একটি বড় নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি পাথরের নাম। এটি এমন একটি পাথর যেখানে দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তার পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কা'বার দেয়াল উচু করতেন। এ পাথরের গায়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি পাথরের উপর পদচিহ্ন পড়ে যাওয়া মহান আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন। এই পাথরটি প্রথমে বায়তুল্লাহ'র নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। কিন্তু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় খিলাফতের 'আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন যেন তাওয়াফকারীগণ পূর্ণভাবে তাওয়াফ করতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকাম-ই-ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়তে চান, তাদের যেন কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। কেননা কুরআনুল কারীমে মাকাম-ই-ইব্রাহীমকে নামাযের মুসাল্লা বানানোর নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى﴾

অর্থাৎ- "আর তোমরা মাকাম-ই-ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"[২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে এই মাকাম-ই-ইব্রাহীম। আর মুজাহিদ বলেন, মাকাম-ই-ইবরাহীমের উপর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর যে পদচিহ্ন রয়েছে ওটাও একটি নিদর্শন। হাতীম, সম্পূর্ণ হারাম শরীফ ও হজ্জের সমুদয় রুকনকেও মুফাস্সিরগণ মাকাম-ই-ইব্রাহীমের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

﴿وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا﴾

অর্থাৎ- "এবং যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।" এ নিরাপত্তা মূলতঃ সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও কিছুই বলত না। কেননা এখানে যুদ্ধ, খুনাখুনি এবং শিকার করা এমনকি গাছ কাটাও নিষিদ্ধ।[৩]

মক্কা বিজয়ের সময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হারামের অভ্যন্তরে কিছু সময়ের জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য কা'বার হারামে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তিনি আরো বলেন : আমার পূর্বে কারো জন্যে হারামের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে।[৪]

ক্বাতাদাহ্ বলেন, হাসান বাসরী বলেছেন, হারাম শরীফ কাউকে মহান আল্লাহর সুনির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বাস্তবায়নে বাধা দেয় না। যদি কেউ হারামের বাইরে অন্যায় করে হারামে প্রবেশ করে তবে তার উপর হদ বা শাস্তি কায়েম

---

[২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*
[৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৪] *বুখারী- হাদীস নং- ১৩৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫৫।*

করতে কোনো বাধা নেই। যদি কেউ হারামে চুরি করে কিংবা ব্যভিচার করে বা হত্যা করে তার উপর শরীয়তের আইন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[৫]

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

অর্থাৎ- "আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তার উপর অবশ্য কর্তব্য।" 'যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে'-এর অর্থ হলো– সম্পূর্ণ রাহা-খরচ পূরণ হওয়ার মতো যথেষ্ট পাথেয় যার কাছে আছে। সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ি-ঘরেই চলাফেরা দুস্কর। এ অবস্থায় হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কীরূপে সম্ভব হবে? তাই রাস্তার ও জান-মালের নিরাত্তা এবং শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদিও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের জন্য মাহরাম (স্বামী অথবা যার সাথে তার বিবাহ চিরতরে হারাম এমন কোনো লোক) থাকা।[৬] এই আয়াতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফর্‌য হওয়ার দলিল রয়েছে। হাদীস দ্বারা এ কথাও পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, হজ্জ জীবনে একবারই ফর্‌য।[৭] হজ্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ বলা হয়। হজ্জের বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থাৎ- "আর যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।" কুরআনুল কারীমের আলোচ্য আয়াতাংশে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে 'কুফ্‌রী' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ থেকে হজ্জ ফর্‌য হওয়ার এবং তা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বহু হাদীসে ও সাহাবীদের উক্তিতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করে না, তার ব্যাপারে কঠোর ধমক এসেছে।[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আয়াতে 'কুফ্‌র' বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তির কাজকে, যে হজ্জ করাকে নেককাজ হিসেবে নিলো না আর হজ্জ ত্যাগ করাকে গুনাহের কাজ মনে করল না।[৯] মুজাহিদ বলেন, কুফ্‌রী করার অর্থ, আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করা।[১০] মোটকথা বান্দা বড়-ছোট যে ধরনের কুফ্‌রই করুক না কেন তার জানা উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখাপেক্ষী নন। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। যদি সমস্ত লোকই কাফির হয়ে যায় তবুও এতে তার রাজত্বে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন-

﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

"তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য।"[১১]

তিনি আরো বলেন :

﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

"অতঃপর তারা কুফ্‌রী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"[১২]

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার বান্দাদেরকে আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ বান্দাদের উপকারার্থেই দিয়ে থাকেন। এ জন্যে দেন না যে, বান্দার আনুগত্য বা অবাধ্যতা মহান আল্লাহর কোনো ক্ষতি বা উপকার করবে।[১৩]

কা'বা ঘরের নামকরাণ ও এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই ঘরটির বেশ কয়েকটি নাম রায়েছে। প্রথমতঃ কা'বা, যার অর্থ 'সম্মুখ' বা 'সামনে'। যেহেতু এই ঘরটিকে সামনে রেখে পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আল্লাহকে সিজদাহ করে, সালাত আদায় করে ও তাওয়াফ করে তাই তাকে কা'বা বলা হয়। কারো কারো মতে কা'বা অর্থ- উচু ঘর। আরবীতে উচু ঘরকে কা'বা বলা হয়। এই ঘরটি যেহেতু উচুস্থানে অবস্থিত তাই তাকে কা'বা বলা হয়। এর আরো

[৫] *তাফসীরে তাবারী।*
[৬] *তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর।*
[৭] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৯] *তাফসীরে তাবারী।*
[১০] *তাফসীরে তাবারী।*
[১১] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ৮।*
[১২] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ৬।*
[১৩] *আদ্‌ওয়াউল বায়ান।*

একটি নাম হলো– বায়তুল্লাহ, এর অর্থ- আল্লাহর ঘর। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এটিকে নিজের ঘর (بَيْتِيَ অর্থাৎ- আমার ঘর) বলে সূরা আল হজ্জের ২৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাই তাকে বায়তুল্লাহ বা মহান আল্লাহর ঘর বলা হয়। এ ঘরের আরো একটি নাম সূরা আল মায়িদার ৯৭ নং আয়াতে এসেছে, আর তা হলো– বায়তুল হারাম। এখানে যেকোনো প্রকার গুনাহ এবং যাবতীয় নাজায়িয কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধও এখানে নিষিদ্ধ। তাছাড়া এটি হারাম সীমানায় অবস্থিত বলেও তাকে বায়তুল হারাম বলা হয়। (হারাম সীমানা হলো– পশ্চিম দিকে জেদ্দার পথে 'আশ-শুমাইসি' নামক স্থান পর্যন্ত। যাকে আল-হুদায়বিয়া বলা হয়। এটি মক্কা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। পূর্বে 'ওয়াদিয়ে উয়ায়নাহ্' নামক স্থানের পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থান পর্যন্ত। এটি মক্কা থেকে ৭ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ আছে, যা 'আয়িশাহ্ মসজিদ নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব দিকে 'জি-ইরানাহ' এর পথে শারায়ে মুজাহেদিনের গ্রাম পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১৬ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। দক্ষিণে 'তিহামা' হয়ে ইয়ামেন যাওয়ার পথে 'ইজাআত লিবন' নামক স্থান পর্যন্ত, যা মক্কা থেকে ১২ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।) সূরা আল হজ্জের ২৯ ও ৩৩ নং আয়াতে এটিকে الْبَيْتِ الْعَتِيقِ অর্থাৎ- প্রাচীনতম ঘর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নয়নাভিরাম ও অপরূপ রূপের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত কা'বাঘর দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। প্রতি প্রহরে কোনো গৃহ বা স্থাপনাকে কেন্দ্র করে কোটি মানুষের আবর্তনের ঘটনা দুনিয়ায় আর একটিও নেই। এটিই আমাদের প্রানাধিক প্রিয় কিবলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম দিকে 'বায়তুল মাকদাস'-এর দিকে মুখ করে সলাত আদায় করলেও তার হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা ছিল কা'বাকে কিবলা বানানোর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার সে মনের বাসনা পূর্ণ করে দিলেন। তিনি কা'বাকে কিবলা বানিয়ে দিলেন।

কা'বা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলবী (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় কিতাব তাফসীরে মারেফুল কুরআনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন যে, নভমণ্ডল, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সৃষ্টি করার আগে মহান রাব্বুল 'আলামিন কা'বার জমিন সৃষ্টি করেছেন। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন বাইতুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেন। তারপর কা'বার নিচ থেকে জমিনকে বিস্তৃত করে সারা পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

ইমাম বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আদম এবং হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) দুনিয়ায় আগমনের পর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে তাদেরকে কা'বাঘর নির্মাণের আদেশ দেন। ঘর নির্মিত হয়ে গেলে তাদেরকে এই ঘর তাওয়াফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে বলেন : হে আদম আপনি দুনিয়ার প্রথম মানুষ এবং এ গৃহ মানবজাতির জন্য প্রথম ঘর।[১৪]

কা'বাঘরের এ স্থাপনা নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনে এ স্থাপনা বিধ্বস্ত হয়। পরে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) প্রাচীন ভিত্তির ওপরই এ ঘর পুনঃনির্মাণ করেন। যেমন- উল্লেখ আছে–

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾

অর্থাৎ- "আর স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কা'বাঘরের স্থান ঠিক করে দিলাম।"[১৫]

কোনো কোনো তাফসীরে এসেছে– ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে কা'বাঘর নির্মাণের আদেশ দেওয়ার পর ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে বালুর স্তূপের নিচে পড়ে থাকা কা'বা ঘরের পূর্বের ভিতকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধসে গেলে কা'বার পাশে বসবাসকারী জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। পরে একবার আমালেকা সম্প্রদায়ও এঘর পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর কুরাইশগণ এ ঘর পুনর্নির্মাণ করেন। এ নির্মাণে মহানবী (ﷺ)-ও শরিক ছিলেন এবং তিনিই হাজরে-আসওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের এ নির্মাণ কাজে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মূল ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ এর একটি অংশ (হাতিম) কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নির্মাণে কা'বা ঘরের দরজা ছিল দু'টি, একটি প্রবেশের জন্য এবং অন্যটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্ব দিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উচুতে দরজা নির্মাণ করে যাতে সবাই সহজে ভেতরে

---

[১৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[১৫] *সূরা আল হাজ্জ : ২৬।*

প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেয়, সে-ই যেন প্রবেশ করতে পারে।

রাসূল (ﷺ) একবার 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন, আমার ইচ্ছে হয়, কা'বাঘরের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাঘর ভেঙে দিলে নতুন মুসলিমদের মনে ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দেওয়ার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।

তারপর খোলাফায়ে রাশেদিনের পর ৬৪ হিজরির দিকে মক্কার ওপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ভাগ্নে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কর্তৃত্ব যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি মহানবী (ﷺ)-এর উপরোক্ত ইচ্ছে কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বাঘরের নির্মাণ ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেন।[১৬]

কিন্তু হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াত আমলের কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই পুনঃনির্মাণ করেন। হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী কা'বাঘরকে ভেঙে আবার নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ট ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফাতাওয়া দেন যে, 'এভাবে কা'বাঘরের ভাঙাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বাঘর তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে একে সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। গোটা মুসলিম সমাজ তার এ ফাতাওয়া গ্রহণ করে নেয়। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজ সব সময়েই অব্যাহত থাকে।[১৭]

কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন :

﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾

"আমি ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।"[১৮]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এ বাণী থেকে বুঝা যায় কা'বা হলো– তাওয়াফ, ইতেকাফ ও সলাতের প্রাণকেন্দ্র। তাই পৃথিবীর সকল মসজিদের সম্মুখপানে থাকে এই কা'বা। এই কা'বা হলো– বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলনকেন্দ্র। এর রয়েছে অসাধারণ সম্মোহনি শক্তি। এর ভিত্তি হয়েছিল ইখলাস ও একনিষ্ঠতার উপকরণ দিয়ে শির্কমুক্ত একাত্ববাদের উপর। এই ঘরের মর্যাদা এত বেশি যে, অপবিত্র অবস্থায় এই ঘরে প্রবেশের সুযোগ নেই। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘরের মর্যাদাকে এমনভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন যে, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মানুষ যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যে একবার দেখে তার মনে এই ঘরকে পুনরায় দেখার আগ্রহ তৈরি হয়। মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোনো মানুষই কা'বাঘর তাওয়াফ করে তৃপ্ত হয় না; বরং প্রতিবার তাওয়াফের পর পুনরায় তাওয়াফের বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। সুনানে বায়হাক্বীর একটি বর্ণনায় আছে– ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কা'বাঘরের উপর প্রতিদিন ১২০টি রহমত বর্ষিত হয়। তাওয়াফকারীদের জন্য ৬০টি। সলাত আদায়কারীদের জন্য ৪০টি এবং কা'বার প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের প্রতি বাকি ২০টি।

শিক্ষাসমূহ

এক. ভূ-পৃষ্ঠে নির্মিত প্রথম 'ইবাদতগাহ কা'বা।

দুই. কা'বা হলো– বিশ্বমুসলিমের মিলনকেন্দ্র।

তিন. কা'বার কারণেই মক্কা ও তার আশপাশের এলাকা শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত। বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

চার. সামর্থ্যবানদের জন্য হজ্জ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ হলো 'উমরাহ্ ও হজ্জের প্রাণ।

পাঁচ. যে কা'বার চত্তরে প্রবেশ করবে সে ক্ষুদা ও সঙ্কা মুক্ত থাকবে।

ছয়. এখানে রয়েছে– হাজরে আসওয়াদ, মাক্বামে ইবরাহী, জমজম কূপ ও সাফা-মরাওয়ার মতো মহানশ্রষ্টার বেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সাত. যে ব্যক্তি এই কা'বাকে অবহেলা-অবজ্ঞা করবে নিঃসন্দেহে সে কাফির। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ সকল কাফিরদের মুখাপেক্ষি নন। ❑

---

[১৬] *তাফসীরে নূরুল কুরআন- আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২, পৃষ্ঠা নং- ৪৪৫।*

[১৭] *তাফসীরে নূরুল কুরআন- আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৪৪৪।*

[১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালনকারী নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ : "مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ শেষ করল এবং হজ্জ সমাপ্তিকালে কোনো ধরনের অশ্লীল কথা, কিংবা পাপ কাজে রত হলো না, সে যেন সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল।[১৯]

হাদীসের ব্যাখ্যা

হজ্জ মুসলমানদের জন্য ফর্‌য বা আবশ্যিক ‘ইবাদত। প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর হজ্জ ফর্‌য করেছেন। হজ্জ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও মৌলিক ‘ইবাদত। আত্মিক উন্নতি, সামাজিক সম্প্রীতি ও বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব সর্বাধিক। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য-সংহতি গড়তেও হজ্জের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব মুসলিমের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনাও লাভ করা যায় হজ্জের বিশ্ব মহাসম্মিলন থেকে। হজ্জ শুধু ‘ইবাদতই নয়; বরং আত্মিক পরিশুদ্ধতার এক অনস্বীকার্য পদ্ধতি। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জের বিনিময় নিশ্চিত জান্নাত। ইসলামী শরীয়তে হজ্জ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত, সিয়াম ও যাকাতের মতো হজ্জ পালন করা সামর্থ্যবানদের উপর ফর্‌য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

“আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে হজ্জ করা মানুষের উপর ফর্‌য যারা যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। আর যে তা অমান্য করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।”[২০]

তিনি আরো বলেন :

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

“তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ‘উমরাহ্ সম্পূর্ণ করো; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করো। আর কুরবানীর জন্তুগুলো তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয় বা তার মাথায় অসুখ থাকে তবে সে রোযা কিংবা সাদাক্বাহ্ অথবা কুরবানী দ্বারা সেটার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় থাকো তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ‘উমরাও করতে চায়, তবে যা সহজ প্রাপ্য তাই কুরবানী করবে; কিন্তু কেউ যদি তা না পায় তবে হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে আসো তখন সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন রোযা রাখবে; এটা তারই জন্যে যে মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।”[২১] অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

“আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-

---

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৯] *আবূ দাউদ- ১১৪৯, তাহক্বীক্ব : আলবানী সহীহ, তাখরীজ : আলবানী; ইরওয়াহ- হা. ৬৩৯; আবূ দাউদ- হা. ১০৪৩।*

[২০] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৯৭।*

[২১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*

দূরান্ত হতে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং রিয্ক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[২২] হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফর্য করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ সম্পাদন করো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বছর? তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোনো কিছু করার নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং যখন তোমাদের কোনো কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করো'।[২৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ (ﷺ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আক্বরা' ইবনু হাবেস নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর ফর্য না জীবনে একবারই ফর্য? তিনি বললেন, না; বরং হজ্জ জীবনে একবার ফর্য। যে অধিক করবে তা তার জন্য নফল হবে।[২৪] আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে–

«مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হজ্জ সম্পাদন করল।"

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির একটি। অশেষ সাধনামণ্ডিত এবং ফযীলতময় এই 'ইবাদতে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসিদ্ধি লাভ ও সুনাম অর্জনের জন্য কেউ হজ্জ করলে এর ফলাফল সওয়াবশূন্য ও রিয়াপূর্ণ বড় পাপবিদ্ধ 'আমল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ﴾

"আর তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করে।"[২৫]

বস্তুতঃ 'ইবাদতের প্রত্যাশিত ও কাঙ্খিত ফলাফল পূর্ণরূপে নিয়ত তথা অন্তরে লুকায়িত অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তিশীল। জনপ্রসিদ্ধি কামনা করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন আদৌ সম্ভবপর নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"নিশ্চয় সকল কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে, সে তাই পাবে।"[২৬]

সুতরাং হজ্জের মতো ব্যয়সাধ্য ও কষ্টলব্ধ 'ইবাদতের শুরুতেই নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ ও ইখলাস সমৃদ্ধ করে নিতে হবে।

«فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ».

"তাতে কোনোরূপ পাপাচার এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো না।"

আল্লাহ তা'আলা হজ্জ সফরের প্রারম্ভ থেকে শেষাবধি যাবতীয় অশ্লীল কর্ম, পাপ-পঙ্কিলতা এবং ঝগড়া বিবাদকে চরম নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাক্বওয়ার চূড়ান্ত পাথেয়কে প্রকৃত সম্বল করার উপদেশ দিয়ে বলেন,

---

[২২] *সূরা আল হাজ্জ : ২৭-২৮।*

[২৩] *মুসলিম- হা. ১৩৩৭; মিশকাত- ২৫০৫; ইরওয়া- হা. ৯৮০।*

[২৪] *আবূ দাউদ- হা. ১৭২১; ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৮৬; আহমাদ- হা. ২৬৪২; আদ্ দারেমী- হা. ১৭৮৮, সনদ সহীহ।*

[২৫] *সূরা আল বাইয়িন্যাহ্ : ৫।*

[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১।*

﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

“হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। অতঃপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ সংগত নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।”[২৭]

অশ্লীলতা আর পাপাচারিতার দোষে নিজেকে কলঙ্কিত করে, আর ঝগড়া বিবাদের হীনতায় ডুবে গিয়ে সেই হজ্জ থেকে পুণ্য আশা করা মনোরোগ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। অথচ মহান আল্লাহর বাণী তাদেরকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ জানিয়ে রেখেছে,

﴿وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾

“যে সীমালঙ্ঘনপূর্বক তাতে (মাসজিদুল হারামে) পাপ কাজের ইচ্ছা করে, তাকে আমি মর্মান্তিক শাস্তি আস্বাদন করাব।”[২৮]

«رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

“সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরল, যেন তার মা সেদিন তাকে ভূমিষ্ট করেছে।”

হাদীসের আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “পাপমুক্ত হয়ে ফিরে আসে, এর প্রকাশমান অর্থ হলো– সাগীরা, কাবীরা গুনাহসমূহ এবং পরিণতি বরণ হতে ক্ষমা পেয়ে যায়।”[২৯]

মহান আল্লাহর নিকট মাকবুল হজ্জের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : "إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ". قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : "جِهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ". قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : "حَجٌّ مَبْرُوْرٌ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম?” তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হলো– এর পর কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন : মহান আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– এরপর কোন্ কাজ উত্তম? তিনি বললেন : হাজ্জে মাবরূর অর্থাৎ- মকবুল হজ্জ।[৩০]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضي الله عنها) أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ : " لَا، لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ".

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমরা (মেয়েরা) যুদ্ধকে সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি। আমরা কি যুদ্ধে শামিল হব না? তিনি বললেন : না; বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যুদ্ধ হলো হাজ্জে মাবরূর (মকবুল হজ্জ)।[৩১]

হজ্জ দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ বিদূরিত করে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা হজ্জ ও ‘উমরার মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো (অর্থাৎ- সাথে সাথে করো)। কেননা এ দু’টি মু’মিনের দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন- (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়’।[৩২]

হজ্জ পূর্ববর্তী গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়

عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيْلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ)، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ لِأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِيْ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ

---

[২৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*
[২৮] *সূরা আল হাজ্জ : ২৫।*
[২৯] *ফাতহুল বারী বি শারহিল বুখারী- ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী, হা. ১৪৪৯।*
[৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১৯।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২০।*
[৩২] *আত্ তিরমিযী- হা. ৮১০; আন্ নাসায়ী- ২৬৩০; মিশকাত- ২৫২৪; সহীহাহ্- ১২০০; আত্ তারগীব- হা. ১১০৫।*

أَشْتَرِطَ، قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قَالَ : أَنْ يُغْفَرَ لِيْ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُوْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

ইবনু শামাসা আল-মাহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘আম্র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি বায়‘আত করতে পারি। রাসূল (ﷺ) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, কি ব্যাপার হে ‘আম্র? আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ তা‘আলা যেন আমার (পিছনের সব) গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, হে ‘আম্র! তুমি কি জানো না, ‘ইসলাম’ তার পূর্বেকার সকল পাপ বিদূরিত করে দেয় এবং ‘হিজরত’ তার পূর্বেকার সকল কিছুকে বিনাশ করে দেয়। একইভাবে ‘হজ্জ’ তার পূর্বের সবকিছুকে বিনষ্ট করে দেয়’?[৩৩]

হজ্জের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘এক ‘উমরাহ্ অপর ‘উমরাহ্ পর্যন্ত সময়ের (সগীরা গুনাহের) কাফ্ফারাস্বরূপ। আর জান্নাতই হলো কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান’।[৩৪]

হাজীদের প্রতিটি পদচারণায় নেকি অর্জিত হয় ও গুনাহ বিদূরীত হয়

عن اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا لَا يَضَعُ قَدَمًا، وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بها حسنة، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর সাতটি ত্বাওয়াফ করবে, এই সময় প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকি লিখেন এবং একটি গুনাহ বিদূরীত করেন এবং একগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[৩৫]

উপসংহার

হজ্জ শুধুই ‘ইবাদত নয়। বিশ্বভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। হজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্র হয়। ভাষা-বর্ণের ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক-জাতীয় পরিচয়ের পার্থক্য ও ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব মুসলিমের ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত ও সুসংহত হয় পবিত্র হজ্জ উদযাপনে। বিশ্ব মুসলিমের পারস্পরিক দুঃখ-অভাব, অভিযোগ-সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তার সমাধানের সুযোগ হয় পবিত্র হজ্জের বিশ্ব সম্মিলনে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সংহতিতেও হজ্জের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের মওসুমে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় বিশেষত সৌদি আরবের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। এ সময় ব্যবসায়ী বিশ্ব মুসলিম নেতারা আলাপ-আলোচনা-চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতে পারেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম নেতারা পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারেন। এতে বিশ্ব মুসলিম নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠতে পারে। হজ্জের সময় তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত ও সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের শিকার মুসলিম বিশ্বের জন্য হজ্জ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হজ্জ মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং অধিকার আদায়ের সুযোগ করে দেয়। হজ্জ মওসুমে মুসলিম বিশ্বের নেতারা বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মতভেদ নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়া হজ্জের বিশ্ব সম্মিলন থেকে মুসলিম নেতারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আধিপত্যবাদীদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদসহ প্রচারিত অন্যান্য অপবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের করণীয় সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনাও দিতে পারেন তারা। ❑

---

[৩৩] *মুসলিম- ১২১; ইবনু হিব্বান- ২৫১৫; মিশকাত- হা. ২৮।*

[৩৪] *বুখারী- ১৭৭৩; মুসলিম- হা. ১৩৪৯; মিশকাত- হা. ২৫০৮।*

[৩৫] *ইবনু হিব্বান- হা. ৩৬৯৭; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১১৪৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৫২৮।*

প্রবন্ধ

বৃষ্টির দিনের আযান : একটি মৃত সুন্নাত

–আব্দুর রউফ*

ভূমিকা : আযানের শব্দ পরিবর্তন সহীহ হাদীসেরই ‘আমল। হাদীসের আলোকে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আযানের শব্দ পরিবর্তন করা যায়। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের কারণে পাকিস্তান, কুয়েত ও আরব আমিরাত আযানের শব্দে পরিবর্তন এনেছিল। এরপর সে তালিকায় নাম লেখিয়েছে পবিত্র নগরী মক্কা।

যে কারণে আযানের শব্দে পরিবর্তন আনা যায় : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।”[৩৬]

দুর্যোগের কারণে আযানে পরিবর্তন করা যেতে পারে। হাদীসে আযানের শব্দ পরিবর্তন করে নামাযের জন্য আহ্বান করার কথা রয়েছে। যেমন- যদি কোনো অঞ্চলে আবহাওয়াজনিত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কুয়াশায় অথবা মহামারি দেখা দেয় তবে সেসব অঞ্চলের আযানের শব্দে পরিবর্তন করা যেতে পারে মর্মে অনেক হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

সহীহ হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়াজ্জিনকে তা করতেও বলেছেন। হাদীসে দু’টি শব্দ এসেছে। তার একটি হলো– صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ. ‘সাল্লু ফি বুযুতিকুম’। আর অন্যটি হলো– أَلَا صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ. ‘আলা সাল্লু ফি রিহালিকুম’। পবিত্র মক্কা নগরীর আযানে ‘আলা সাল্লু ফি রিহালিকুম’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

দলিলসমূহ– দলিল নং- ১ : হাদীসে এসেছে–

প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাজনান নামক স্থানে আজান দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন– صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ. ‘সাল্লু ফি রিহালিকুম’ অর্থাৎ- ‘তোমরা আবাসস্থলেই নামায আদায় করে নাও’। পরে তিনি সবাইকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা তীব্র শীতের রাতে মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা নিজ বাসস্থলে নামায আদায় করো।[৩৭]

দলিল নং- ২ : ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক বৃষ্টিঝরা দিনে তিনি মুয়ায্যিনকে বললেন : আজকের আযানে যখন তুমি “আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্ল-হ” বলে শেষ করবে তার পরে কিন্তু “হাইয়া আলাস্ সলা-হ” বলবে না; বরং বলবে– “সল্লু ফী বুয়ুতিকুম”, অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই সলাত আদায় করে নাও। হাদীসের বর্ণনাকারী (‘আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস) বলেছেন : এরূপ করা লোকজন পছন্দ করল না বলে মনে হলো। তা দেখে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : তোমরা এ কাজকে আজগুবি মনে করছ? অথচ যিনি আমার চেয়ে উত্তম তিনি এরূপ করেছেন। জুমু‘আর সলাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তোমরা কাঁদাযুক্ত পিচ্ছিল পথে কষ্ট করে চলবে তা আমি পছন্দ করিনি।[৩৮]

আর সম্প্রতিক মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাবে কুয়েত, আরব আমিরাত, পাকিস্তানের পর পবিত্র নগরী মক্কায় আযানের শব্দ পরিবর্তনে কোনো অসুবিধা নেই। হাদীসের আলোকে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আযানের শব্দ পরিবর্তন করা যায়।

নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেনঃ তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা তীব্র শীতের রাতে মুয়ায্যিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা নিজ বাসস্থলে সালাত আদায় করো।[৩৯]

দলিল নং- ৩ : বর্ষণমুখর দিনে গৃহে সলাত আদায়–

মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রাহিমাহুল্লাহ) ... ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি শীত ও ঝড়-বৃষ্টি কবলিত এক রাতে সলাতের আযান দিলেন। তিনি তার

---

* **মুহাদ্দিস-** *মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৩৬] *সূরা আল হাজ্জ : ৭৮।*

[৩৭] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৬৩৫।*

[৩৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬/৬৯৯, ই. ফা. বাং, হা. ১৪৭৪, বাং ই. সে., হা. ১৪৮২; সহীহুল বুখারী- হা. ৯০১।*

[৩৯] *বুখারী- ১০/১৮, ই.ফা.বাং, ৬৩৩; মুসাফিরদের জামা‘আতের জন্য আযান ও ইক্বামাত দেয়া, ৬৩২, ৬৬৬, আ. প্র., ৫৯৬, ই. ফা. বাং, ৬০৪; মুসলিম- ৬/৩, ৬৯৭; আহমাদ- ৪৫৮০।*

আযান শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, শুনো! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানস্থলে সলাত আদায় করে নাও। শুনো! তোমরা অবস্থানস্থলে সলাত আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফররত অবস্থায় শীত বা বর্ষণমুখর রাতে মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে– শুনো! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সলাত আদায় করে নাও।[৪০]

নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাজনান নামক জায়গায় সলাতের জন্য আযান দিলেন, অতঃপর ঘোষণা করলেন, সকলেই নিজ নিজ জায়গাতে সলাত আদায় করে নাও। নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতঃপর ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, সফরে বৃষ্টি কিংবা শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণাকারীকে সলাতের জন্য ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর সে ঘোষণা করতো : তোমরা নিজ নিজ জায়গায় সলাত আদায় করে নাও।[৪১]

ঝড়-বৃষ্টির সময় আযানের শব্দ যেভাবে পরিবর্তন করতে হবে : ঝড়-বৃষ্টি বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় মসজিদ আসতে কষ্ট হলে মুআয্যিন আযানে নিম্নলিখিত শব্দ অতিরিক্ত বলব।

১ম নিয়ম : ‘হাইয়্যা আলাস স্বলাহ্’ ও ‘ফালাহ্’র পরিবর্তে– صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ (স্বল্লূ ফী বুয়ূতিকুম)[৪২] অথবা اَلصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ (আসস্বলা-তু ফির্রিহাল)[৪৩]।

২য় নিয়ম : অথবা যথানিয়মে আযান দেওয়ার শেষে– أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ (আল স্বল্লূ ফির্রিহাল)[৪৪] অথবা أَلَا صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُم (আলা স্বল্লূ ফী রিহা-লিকুম)[৪৫] অথবা وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ (অমান ক্বাআদা ফালাহারাজ)[৪৬]। এগুলোর অর্থ হলো ‘শুনো! তোমরা নিজ নিজ বাসায় নামায পড়ে নাও। জামা‘আতে হাজির না হলে কোনো দোষ নেই।

উপসংহার : এটি নতুন কিছু নয়, এটি রাসূল (ﷺ) থেকে চলে আসা একটি সুন্নাত। ❑

[৪০] *মুসলিম- ২৩/..., ই. ফা. বাং, ১৪৭১, বাং ই. সে. হা. ১৪।*
[৪১] *সুনান আবূ দাঊদ- অনুচ্ছেদ– ২১৪ : শীতের রাতে জামা‘আতে উপস্থিত না হওয়া, হা. ১০৬১, সহীহ।*
[৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯০১; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৯।*
[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৬।*
[৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩২; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৭।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩২; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৭।*
[৪৬] *ইআশা; বায়হাক্বী- ১/৩৯৮; সহীহাহ্- আলবানী, হা. ২৬০৫।*

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা‘ঈল শহীদ (রাহি.) বলেন

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা ক্বুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি ক্বুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ‘আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *(তাকভিয়াতুল ঈমান)*

আল্লামা মোহাম্মদ ‘আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহি.) বলেন

দা’ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা’ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা। আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *(আহলে হাদীস পরিচিতি)*

আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহি.) বলেন

দুনিয়াতে কোনো ‘ইজম’ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবি করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *(অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.)*

আলোকিত জীবন

শেরে বাংলা : কিংবদন্তীর রাজনীতিক

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*
প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক*

[প্রথম পর্ব]

প্রখর মেধার অধিকারী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে আশীর্বাদস্বরূপ। বিংশ শতকের শুরুতে বাংলার জনসাধারণের অত্যাচার ও দুর্ভোগের রাজসাক্ষী তিনি নিজেই। 'সোনার চামুচ' মুখে নিয়ে আবির্ভূত ফজলুল হকের জীবনপ্রবাহ সাধারণ মানুষের সাথে একই সূত্রে গাঁথা ছিল। ইংরেজদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির আওতায় মুসলমানরা আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে নিপতিত হয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দু সাধারণেরও একই অবস্থা! ইংরেজ সৃষ্ট মুৎসুদ্দীদের সহায়তার ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীরা এদেশের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করে। বাঙালি কৃষক সমাজ যাদের নিয়ে গঠিত, সেই মুসলমান, নমঃশূদ্র ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর জমিদার মহাজনদের শোষণ নিপীড়ন চলছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা কিংবা সামাজিক মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল না বললেই চলে। এমনি এক সময়ে হক সাহেবের উত্থান অবহেলিতদের আশান্বিত করে তুলেছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ খুঁজে পেয়েছিলেন উপযুক্ত সহকারী ও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

আবুল কাশেম ফজলুল হক বরিশালের রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর। পিতা উকিল মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন ভূস্বামী। ব্যক্তিগত উপার্জনও পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত বিশাল সম্পদের কর্ণধার ওয়াজেদ আলী একজন অমিততেজ কৌসূলী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ফজলুল হকের পূর্বপুরুষ উত্তর প্রদেশের ভাগলপুরের গাযীপুর থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফলে বসতি স্থাপন করেন। এই ঐতিহ্যবাহী পরিবার চট্টগ্রামের ফৌজদার আগাবাকের খানের পরিবারের শোনিতধারার সাথে মিশে যায়।

বরিশালে উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়, মৌলভী মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন তাঁর অগ্রদূত। শুরুতেই ওয়াজেদ আলী কংগ্রেসের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৮৭৩ সালে বরিশালের কংগ্রেসের এক বিশাল সভায় অংশগ্রহণ করে দেশবাসীকে অবহিত করেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতীক ওয়াজেদ আলী স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তনের পক্ষে কাজ করেন। পি এল রায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের পক্ষে বাংলার ছোট লাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উদ্ভূত সংকটের সুরাহা ও সমাধান যেন ছিল ওয়াজেদ আলীর ব্রত। পৌরসভা, জেলাবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় সরকারে যোগ দিয়ে জনসাধারণের দুর্দশালাঘবে সদা সচেষ্ট থাকতেন।

উনিশ শতকে বরিশালের মুসলিম সমাজ নানা কুসংস্কারে আছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো তাদের দ্বারে তখনও পৌঁছেনি। পলাশী, বালাকোট ও সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের বিপর্যয়ের ধকল তখন কাটিয়ে উঠেনি। ১৮৭২ সালে বরিশালের ১২ লাখ মুসলমানের মধ্যে শতকরা একজনেরও কম শিক্ষিত ছিল।[৪৭] শিক্ষার এই ভয়াবহ চিত্রে মো. ওয়াজেদ আলী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। বরিশালে মুসলমান শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে বেল ইসলামিয়া মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ ওয়াজেদ, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিটসন বেল এই ত্রয়ী গুনীজন ছিলেন ছাত্রাবাসের কারিগর। ম্যাজিস্ট্রেট বিটসন বেলের নামানুসারে ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয়।

* **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।
* **প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৪৭] সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, বরিশাল : ভাস্বর প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২৯।

ধর্মীয় আর্থিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য ওয়াজেদ আলী সাহেব ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ১৮৯৩ সালে গড়ে তুলেন আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম। আঞ্জুমানে হেমায়েত বরিশালে মুসলিম সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতো। কলকাতা মোহামেডান শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে ১৮৯৯ সালে বরিশালে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াজেদ আলী এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। মৌলভী ওয়াজেদ আলী একজন রাজনীতিক, সংগঠক ও দক্ষ আইনজীবী ছিলেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মামলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবে প্রিয় ছিলেন। বরিশাল বি. এম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও তৎকালীন মুসলমান নেতা খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন তাঁকে পরম ভক্তি করতেন। মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মাত্র ৫৮ বছর বয়ঃক্রমভাবে ১৯০১ সালে ইন্তেকাল করেন। রেখে যান উপযুক্ত পুত্র ও বাংলার ভবিতব্য অভিভাবক এ. কে ফজলুল হককে।

পরম পিতৃভক্ত ফজলুল হক পিতৃবিযোগের বছরই বরিশালে আগমন করেন এবং বরিশাল বারে যোগদান করেন। লেখাপড়াও শিক্ষানবিস হিসেবে ফজলুল হকের জীবনের এই যুগটি ছিল বড়ই চমকপ্রদ। ফজলুল হক ছাত্রজীবন থেকেই সমাজ সচেতনতার কাজ করেন মর্মে কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন, কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড, আলীগড় আন্দোলন, প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁর জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে মুসলিম পূনর্জাগরনের যৌক্তিকতাও ঘটনা প্রবাহ তাঁর মানস চিন্তাকে প্রসারিত করে।

আকর্ষনীয় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ফজলুল হক ভাগ্যবান ছিলেন। সমকালীন যামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, ড. হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র, বিহারীলাল রায় ও ব্যারিস্টার পি এল রায় প্রমুখের সাথে তাঁর পরম সখ্যতা ছিল। তাঁর মানবিক ঔদার্য ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনার শেকড়ে সিঞ্চিত বারিতে পল্লবিত হয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। দুঃস্থ, বঞ্চিতদের ও আর্তমানবতার সেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

তিনি হিন্দু অধ্যুষিত তদানীন্তন বরিশাল পৌরসভা ও জেলাবোর্ডে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এভাবে ফজলুল হক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বলাবাহুল্য, এ অভিজ্ঞতা তাঁর সুপ্তরাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে। তিনি অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

ফজলুল হকের রাজনীতিতে হাতে খড়ি একান্তভাবে তাঁর সুপ্ত বাসনার ফলশ্রুতি বলা যায়। একজন মানুষের অগ্রযাত্রায় নানা ধরনের মহিমাময় প্রপঞ্চ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ফজলুল হকের ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাই। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ চিরবঞ্চিত ও শোষিত বাঙালীদের ভাগ্যাকাশে এক চমকপ্রদ অধ্যায়। সিরাজ উদ্দিন আহমেদ লিখেন :

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিক থেকে নানা কারণে উপমহাদেশের মুসলমানরা শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির মূল প্রবাহ থেকে প্রতিবেশী হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলমান, সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার অসম বিকাশের কারণে সরকারি চাকুরী, রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যথাযথ মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলে জনসাধারণের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে ভেবে যুবক ফজলুল হক বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, এক বুকভরা আশা নিয়ে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন ও স্যার সলিমুল্লাহর পাশে এসে দাঁড়ান।" জনস্বার্থ বিবেচনায় ফজলুল হক এক সময়ের রাজনীতির গুরু ও বন্ধু প্রতীম অশ্বিনী কুমার দত্তের মুখোমুখি হন। বঙ্গভঙ্গ নস্যাৎ করবার জন্য ব্যারিষ্টার সৈয়দ মোতাহার হোসেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত অন্যতম ছিলেন। তারা বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়ান।

সিরাজ উদ্দিন আহমেদ আরো লিখেন : বঙ্গভঙ্গের সময় ফজলুল হক স্যার সলিমুল্লাহর সান্নিধ্যে আসেন এবং নতুন প্রদেশ ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে নিজকে একাত্ম করেন। নবাব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ঢাকায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। বরিশাল থেকে এ. কে ফজলুল হক এই সম্মেলনে যোগ দেন।" বঙ্গভঙ্গ ফজলুল হকের রাজনৈতিক মানস গঠনে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে।

ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের পুষ্টিসাধনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা অন্যতম।

বস্তুতঃ বিশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। আর দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ১৯০৫ সালে ইতিমধ্যেই আমরা আলোকপাত করেছি। বঙ্গভঙ্গের সুফল গ্রামবাংলার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উপায় ছিল শিক্ষা বিস্তার। এ ধারণায় উজ্জীবিত ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ। স্যার সলিমুল্লাহর মানস পুত্র বিলক্ষণ তা অনুধাবন করেন। ১৯০৬ সালে আহ্বান করেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স। এ সম্মেলনে স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক মুসলিমলীগ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মুসলিমলীগ জন্ম লাভ করে। সিরাজ উদ্দীন আহমেদ বলেন : পরবর্তীকালে ফজলুল হক বলতেন, "মুসলিমলীগের জন্মলগ্নে তিনি একজন ধাত্রীরূপে কাজ করেছেন। রাজনীতির মাঠে তুখোড় খেলোয়াড় ফজলুল হকের সাংগঠনিক দক্ষতা ও ইংরেজি ভাষায় ঈর্ষনীয় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ স্যার সলিমুল্লাহ বলেন; 'ফজলু তুমি আমার গদিটা নেও এবং তোমার মাথাটা আমাকে দাও'।

রাজনীতির মঞ্চ নির্মাণের দুরদর্শী কারিগর ফজলুল হকের অবদান অবিস্মরণীয়। বুভুক্ষ ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে দিবানিশি ভাবনায় বিভোর থাকতেন। পিতৃভক্তি ও দেশপ্রেম ছিল তাঁর মজ্জায় বিমিশ্রিত প্রোটিনজাত উদ্দীপক উপাদান।

মৌলভী মুহাম্মদ ওয়াজেদের ইচ্ছা ছিল পুত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। হলেনও তাই। বঙ্গ ভঙ্গের সমর্থনগত তৎপরতার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অপূর্ব প্রতিভা ও দক্ষতায় পূর্ব বাংলা ও আমাদের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমনি ধরনের একজন চৌকষ ও মেধাবী সিভিল সার্ভেন্টের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং স্যার সলিমুল্লাহর সুপারিশক্রমে ফজলুল হককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেন।

ফজলুল হকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ তার রাজনৈতিক জীবনের অপরিহার্যতাকে অনিবার্য করে তোলে। তিনি ঢাকা ময়মনসিংহ ও জামালপুরে চাকরি করে সমস্যার বাস্তব সূত্র ও সংকট নিরসনের পাঠ লাভ করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চিড় ধরে। সে ধারাবাহিকতায় জামালপুরে দাঙ্গা শুরু হয়। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অবসর সময়ে সাধারণ বেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখতেন। জামালপুরের এসডিও থাকাকালে তিনি জামালপুরের জমিদার ও মহাজনদের নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রভাব ফেলে। তিনি দেখেছেন, কি করে ৫ টাকার জন্য জমিদার কৃষকদের ভিটেমাটি ছাড়া করে, কি করে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের জন্য তাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়া হয়? এসব দেখে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, জমিদারী প্রথা উৎখাত করবেন। প্রবর্তিত এই জমিদারী প্রথা কৃষক সমাজের অকল্যাণের মূলত্রুটি হিসেবে অনুধাবন করেছিলেন। সরকারি চাকুরিতে অর্পিত দায়িত্ব বহির্ভূত কাজকর্মে আঞ্জাম দেখার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। এতদসত্বেও তিনি বাংলার প্রাণ বিপর্যস্ত কৃষককূলকে রক্ষার জন্য মাদারীপুরে এসডিও'র মত লোভনীয় পদ বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় সমবায়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে যোগ দেন।

এ সুযোগে তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গে কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করেন। তিনি গ্রামের পর গ্রাম পরিদর্শন করে কৃষকদের বাস্তব অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারীতে গাইবান্ধার এক জনসভায় সমবায়ের চাকুরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন :

"সুদুর পাড়া গায়ে খালি পায়ে লুঙ্গি পরে আমি কৃষকদের সাথে ধান খেতের আলের উপর বসে তাদের ডাবাহুকায় তামাক খেতে খেতে তাদের সব অভাব, অভিযোগ শুনতাম। কৃষক গৃহিণী প্রদত্ত পান্তাভাত কাঁচা মরিচ দিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে দিনের পর দিন খেয়েছি, তার স্বাদ আজও আমি ভুলতে পারিনি। কৃষক-প্রজার দুঃখ-দুর্দশার কথা আমাকে বই পড়ে জানতে হয়নি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কোথায় তাঁদের অভাব? কোথায় তাদের বেদনা? কৃষক প্রজার দুঃখ দূর করা আমার আজীবনের স্বপ্ন।"

প্রজা সাধারণে দুঃখ-দুর্দশা দর্শন পরবর্তীকালে তার সমগ্র চিন্তা, কর্ম প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। ফজলুল প্রজাদের ক্লেশ নিবারণে বদ্ধপরিকর হন এবং পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

ক্বাসাসুল হাদীস

তামিম দারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

দাজ্জাল এমন একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি শেষ যামানায় যার আবির্ভাব হবে। তার আবির্ভাবে শেষ যামানায় অনেক বড় বিপর্যয়ের কারণ হবে। সব নবী-রাসূলগণ তার ফিতনা থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কেননা অনেক আশ্চর্যজনক কিছু বিষয় আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা ঘটাবেন এবং সে তার সময়কালে মানুষের 'আক্বিদায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ছাড়বে। দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় আলামত। তার ফিতনা থেকে মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও খুব সতর্ক করেছেন। আর সেই দাজ্জালের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী তামীমদারীর। শোনা যাক সাক্ষাতের সেই ঘটনাটি :

আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত। তিনি যাহহাক ইবনু কায়সের বোন ফাতিমাহ্ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। যে সমস্ত মহিলাগণ প্রথমে হিজরত করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম।

তিনি বলেন, আপনি, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে হাদীস শুনেছেন, অন্যের দিকে সম্বোধন করা ব্যতিরেকে, এমন একটি হাদীস আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি শুনতে চাও, তবে অবশ্যই আমি বর্ণনা করবো।

সে বলল, হ্যাঁ আপনি বর্ণনা করুন।

তিনি বললেন, আমি ইবনু মুগীরাকে বিবাহ করেছি। তখন তিনি কুরায়শী যুবকদের উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হয়েই তিনি শহীদ হয়ে যান। আমি বিধবা হয়ে যাবার পর 'আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আমার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। পয়গাম পাঠান রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরো কতিপয় সাহাবী।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও তাঁর আযাদকৃত গোলাম উসামাহ্ ইবনু যায়িদের জন্য পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ হাদীসটি আমি পূর্বেই শুনেছিলাম যে,

তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন উসামাহ্কেও ভালোবাসে।

ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার পর আমি তাকে বলেছি, আমার বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম। আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উম্মে শারীকের নিকট চলে যাও। উম্মে শারীক একজন আনসারী বিত্তশালী মহিলা। মহান আল্লাহর পথে সে অধিক ব্যয় করে এবং তার নিকট অধিক অতিথি আসে। একথা শুনে আমি বললাম, আমি তাই করব।

তখন তিনি বললেন, তুমি উম্মে শারীকের নিকট যেয়ো না। কেননা উম্মে শারীকের কাছে অনেক মেহমানের আনাগোনা এবং আমি এটাও পছন্দ করি না যে, তোমার উড়না পড়ে যাক বা তোমার পায়ের গোছা হতে কাপড় খসে যাক আর লোকেরা তোমার শরীরের এমন স্থান দেখে নিক যা তুমি কখনো পছন্দ করো না। তবে তুমি তোমার চাচাতো ভাই 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাকতুম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট চলে যাও। তিনি বানী ফিহরের এক ব্যক্তি। ফিহর কুরায়শেরই একটি শাখা গোত্র। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) যে খান্দানের লোক তিনিও সে খান্দানেরই মানুষ।

আমি তার নিকট চলে গেলাম। অতঃপর আমার ইদ্দত সমাপ্ত হলে আমি জনৈক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। বস্তুতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত আহবানকারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহ্বান করছিলেন যে, সালাতের উদ্দেশ্যে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। অতঃপর আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম।

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

তিনি বলেন, ক্বাওমের পেছনে যে কাতারে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযান্তে হাসিমুখে মিম্বরে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন : প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে বসে যাও। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, আমি কি জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোনো আশা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এ জন্য একত্রিত করেছি যে, তামীমদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে খ্রিষ্টান ছিল। সে আমার নিকট এসে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। সে আমার কাছে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যা দ্বারা আমার সেই বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের বর্ণনা করেছিলাম।

সে আমাকে বলেছে যে, একবার সে লাখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক নৌকায় আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক তুফান এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর (একদিন) সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই একটি জন্তু তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তার সমগ্র দেহ লোমে আবৃত ছিল। লোমের কারণে তার সম্মুখ অঙ্গ ও পশ্চাত অঙ্গ চিনা যাচ্ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। লোকেরা বলল, গুপ্তচর আবার কি? সে বলল লোক সকল! ঐ যে গীর্জা দেখা যায় সেখানে চলো। সেখানে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে।

তামীমদারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার মুখে এক ব্যক্তির কথা শুনে আমরা ভীত ছিলাম যে, সে আবার শয়তান তো নয়! আমরা দ্রুত হেটে গীর্জায় প্রবেশ করতঃ এক বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। ইতিপূর্বে এমন আমরা আর কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাধা অবস্থায় দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো।

আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে?

সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ।

এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি?

তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। লোমের আধিক্যের কারণে আমরা তার সম্মুখ অঙ্গ ও পশ্চাত অঙ্গ চিহ্নিত করতে পারছিলাম না।

আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে?

সে বলেছে, সে নাকি দাজ্জালের গুপ্তচর।

আমরা বললাম, গুপ্তচর আবার কি!

তখন সে বলেছে, ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি।

আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোনো শয়তান (জিন্, ভূত) কিনা?

অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে বায়সানের খেজুর বাগানের খবর বলো।

আমরা বললাম, এর কোনো বিষয়টি সম্পর্কে তুই সংবাদ জানতে চাচ্ছিস?

সে বলল, বায়সানের খেজুর বাগানে ফল আসে কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি।

আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে।

সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে ফল ধরবে না।

অতঃপর সে বলল, আচ্ছা, তাবারিয়া সমুদ্র সম্পর্কে আমাকে অবগত করো।

আমরা বললাম, এর কোনো বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের থেকে জানতে চাচ্ছিস!

সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি?

তারা বলল, হ্যাঁ, সেখানে বহু পানি আছে।

অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন এ সাগরে পানি থাকবে না।

সে আবার বলল, যুগার এর ঝর্ণা সম্পর্কে তোমরা আমাকে অবহিত করো।

তারা বলল, তুই এর কি সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিস।

সে বলল, এতে পানি আছে কি? এবং এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেতে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি!

আমরা বললাম– হ্যাঁ, এ তে বহু পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ প্রসবনের পানি দ্বারা চাষাবাদ করে। সে পুনরায় বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে সংবাদ দাও। সে এখন কি করছে?

তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন।

সে জিজ্ঞেস করল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে।

সে বলল, সে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে।

আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

সে বলল, এ কি হয়েই গেছে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক ছিল।

এখন আমি নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতিসত্ত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ দিনের ভেতর এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তায়বা এ দু'টি স্থানে আমি প্রবেশ করব না। যখন আমি এ দু'টির কোনো একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশ্‌তা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সামনে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফেরেশ্‌তাদের পাহারা থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার ছড়ি দ্বারা মিম্বরে আঘাত করে বললেন, এই হচ্ছে তায়বা, এই হচ্ছে তায়বা। অর্থাৎ- তায়বা অর্থ এই মদীনাই। সাবধান! আমি কি এ কথাটি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তামীমদারীর বর্ণনাটি আমাকে বিমোহিত করেছে। যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মাদীনা ও মক্কা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি।

সে দ্বীপটি কোথায়?

এরপর ইরশাদ করলেন, 'জেনে রেখো! এই দ্বীপ সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়েমেন সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত, যা পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত।' এ সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমাহ্ বিনতু কাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ হাদীস আমি রাসূল (ﷺ) থেকে সংরক্ষণ করেছি।[৪৮]

হাদীসের শিক্ষা :

১. দাজ্জালকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে সে দুনিয়াতে আসবে; 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাকে হত্যা করবেন। এটাই সত্য। যারা দাজ্জাল নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছেন তারা এ হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করছেন।

২. দাজ্জালও স্বীকার করেছে যে, কেউ যদি মোহাম্মদ (ﷺ)-এর বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তাহলে তারই মঙ্গল হবে কিন্তু মানুষ তা বুঝে না।

৩. দাজ্জাল ডানে-বামে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। কিন্তু মহান আল্লাহর বান্দাগণ ভয় পাবে না; বরং দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে।

৪. দাজ্জালের ফিতনা হতে বাঁচার জন্য সূরা আল কাহ্‌ফ-এর প্রথম দিকের আয়াতগুলো বেশি বেশি পড়া উচিত।

৫. দাজ্জালের আগমন কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত। ❑

[৪৮] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা., বাং, হা. ৭১১৯।*

বিশেষ মাসায়িল

ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক :

মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনই যেহেতু পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই যা কিছু অপরিহার্য সব কিছুরই সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে পবিত্র কুরআনুল কারিমে। হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায় তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে-বুঝতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আজ মুসলিম বিশ্বে কিছু 'আলেমের ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে তাদের অযৌক্তিক ও বিবেকহীন দাবিতে মুসলমানদেরকে কুরআন থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি হলো–

১. ওযূ ছাড়া কুরআন মুখস্থ পড়া যাবে। কিন্তু স্পর্শ করে বা ধরে পড়া যাবে না।

২. ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা মহাপাপ।

হাফেয ছাড়া আমাদের সমাজে বাকি সব মুসলমানদের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশিরভাগ মুসলমানদের তাদের স্বাভাবিক জীবনের অধিকাংশ সময় ওযূ থাকে না। তাই কথাটি অধিকাংশ মুসলমানদের কুরআন স্পর্শ করে পড়ার পথে এক বিরাট বাধা। কথাটি যদি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু না থাকত, তবে সকল বেওযূ মুসলমানদের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকত তা বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটে যে কোনো অবসর সময়ে পড়তে কোনো অসুবিধা হত না। এটা মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানী লোক কম থাকার একটা প্রধান কারণ। বিষয়টি যদি কুরআন-সহীহ হাদীস সম্মত না হয়, তবে তা সংশোধন করা গেলে ইসলাম তথা মুসলমানদের অপরিসীম কল্যাণ হবে।

"ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ" –কথাটির বিপক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীসের যুক্তিসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কুরআন নয় সালাতের আগে ওযূ বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্‌য 'ইবাদত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে গোসল করে পবিত্র হবে।"[৪৯]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন সালাতের ধারের কাছেও যাবে না। যতক্ষণ না বুঝতে পারো কি পড়ছ। অনুরূপভাবে গোসল ফর্‌য অবস্থায়ও সালাতের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করো।"[৫০]

সালাত আদায় করার আগে ওযূ বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা মৌলিক কাজ বা 'আমল যা আল্লাহ তা বিস্তারিতভাবে কুরআনের অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর মহাগ্রন্থ আল কুরআন হলো আমাদের জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয়। কুরআন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার হলে, আল্লাহ তা আরো বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন।

কিন্তু কুরআন পড়া বা স্পর্শের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন একটা কথাও আল কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই; বরং কুরআন পড়ার আগে যে কাজটি অবশ্যই করতে হবে, তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

---

[৪৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬।*
[৫০] *সূরা আন্ নিসা : ৪৩।*

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ অর্থাৎ- "যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।"[৫১] আল্লাহ তা'আলা কুরআন পড়া শুরু করার সময় পবিত্রতা অর্জন করতে না বলে যে, কাজটি বাধ্যতামূলকভাবে করতে বলেছেন তা হচ্ছে– ইবলিস শয়তানের ধোকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে সরানো হচ্ছে শয়তানের প্রথম কাজ। অন্যদিকে ওযূ ছাড়া কুরআন পড়া, স্পর্শ করা বা অন্য কোনো কাজের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন কোনো কথা আল্লাহ কুরআনের কোথাও উল্লেখ করেননি। তাই এ ধরনের কোনো কথা যদি ইসলামে থেকেই থাকে, তবে তা অবশ্যই রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসে থাকতে হবে। এ বিষয়ে হাদীসের বাণী নিম্নে তুলে ধরা হলো–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوْا : أَلَا نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ؟ قَالَ : «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল (ﷺ) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্য ওযূর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন সালাতের প্রস্তুতি নিব তখনই (অথবা তখনই শুধু) ওযূ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি।[৫২]

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ".

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) পায়খানা হতে বের হয়ে বিনা ওযূতে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্ত খেতেন। তাঁকে কুরআন হতে বাধা দিতে পারত না বা বিরত রাখত না জানাবাত (গোসল ফর্য হয় এমন অবস্থা) ব্যতীত অন্য কিছু।[৫৩]

দারাকুতনী, মুস্তাদরাকে হাকিম ও আল ইস্তিযকার গ্রন্থে হাদীসটির "কুরআন হতে বিরত রাখত না" –কথাটার স্থানে কুরআন তিলাওয়াত বা পড়া হতে বিরত রাখত না, কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। গোসল ফর্য অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই নিষিদ্ধ। কিন্তু বে-ওযূ অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই সিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَتَّكِئُ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ﷺ) মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।[৫৪]

সুতরাং হাদীসখানা থেকে সহজে বলা ও বুঝা যায় গোসল ফর্য অবস্থায় কুরআন শুনা নিষেধ নয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষাত হলো। আমি তখন বীর্যপাতের দরুন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সহিত চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনঃ তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি তথায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবূ হুরাইরাহ্? আমি তাঁকে ব্যাপারটা বললাম, তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন : সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক বা অপবিত্র হয় না। রাসূল (ﷺ)-এর এ কথাটি আল কুরআনের সূরা আত্ তাওবার ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বলা চলে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"মুশরিক লোকেরা নাপাক বা অপবিত্র। (অর্থাৎ- মুশরিকরা মানসিক বা 'আক্বিদাহ্গত দিক দিয়ে অপবিত্র) তাই এ হাদীস এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মু'মিন যেমন শারীরিক অপবিত্রতার দরুন মানসিক বা 'আক্বীদাগত

---

[৫১] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৯৮।*
[৫২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৮৪৭; সুনান আবূ দাউদ; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৫৩] *সুনান আবূ দাউদ; সুনান আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[৫৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৭।*

দিক দিয়ে অপবিত্র হয় না তেমনই মুশরিক বা কাফির ওযূ বা গোসল করলেও শারীরিক দিক দিয়ে পবিত্র হয় না।"[৫৫]

"ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ" বর্ণিত হাদীসটি ও তার পর্যালোচনা :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ : إِنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ বক্র ইবনু মুহাম্মদ ইবনু 'আম্র ইবনু হাজম বলেন, রাসূল (ﷺ) 'আম্র ইবনু হাজেম (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর নিকট যে সব লিখিত বিধি-বিধান পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি হুকুম ছিল যে, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[৫৬]

হাদীসটি মুরসাল হিসেবে আবী দাউদ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে–

১. কোনো সহীহ হাদীসের বক্তব্য বা কোনো সহীহ হাদীসের বক্তব্যের ব্যাখ্যা কুরআনের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে না।

২. হাদীস থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয়ের সকল সহীহ হাদীসগুলো পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

৩. শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য কম শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য থেকে অগ্রাধিকার পাবে।

৪. মুরসাল হাদীস (যে হাদীসে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবীর নাম নেই) দ্বারা ইসলামের কোনো বিধান নির্ণয় করা সাধারণভাবে নিষেধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ ○ فِيْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূতঃপবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।"[৫৭]

এ আয়াতটির অর্থ হবে নিষ্পাপ ফেরেশ্তারা ছাড়া সেটা (লওহে মাহফুজের কুরআন) কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এই আয়াতের ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, "যারা পূতঃপবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। অর্থাৎ- ফেরেশ্তারা এটা স্পর্শ করে থাকেন। কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, লওহে মাহফুজে ফেরেশ্তারা ছাড়া আর কেউই যেতে পারে না ও স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদিকে ফেরেশ্তাদের মানুষের ন্যায় প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ত্যাগ বা ফর্য গোসলের অবস্থা হয় না। তাই ফেরেশ্তারা মুতাহ্হারুন এ কারণে তারা পাপ কাজ থেকে মুক্ত অর্থাৎ- নিষ্পাপ। অথচ আজ মুসলিম সমাজে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, "ওযূ ছাড়া কুরআন পাঠ করা গেলেও তা স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ বিধর্মীরাতো দূরের কথা, মহান আল্লাহর দ্বীনের দাবিদাররা নিজেরাই কুরআন থেকে দূরে সরে গেছে স্পর্শ করতে না পারার ভ্রান্ত ধারণায়, যদিও অমুসলিমদের ও কুরআন স্পর্শ করার কোনো বাঁধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

"কুরআন যা মানব জাতির জন্য হিদায়েত এবং সত্য পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।"[৫৮]

মানব জীবন পরিচালনা ও জীবন সমস্যা সমাধানে কুরআন যে নীতিমালা পেশ করেছে, তা বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারলে জীবন হয়ে উঠবে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। আমরা কুরআন ত্যাগ করছি বলেই কুরআনের সুফল ভোগ করতে পারছি না, জড়িয়ে পড়ছি নানা সমস্যা ও সংকটে।

পরিশেষে আহ্বান করি, আসুন! কায়মনোবাক্যে রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমতা এবং সুযোগ দেন, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে সকল কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, তা সমাধানে ব্যাপকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারি –আমীন। ❑

---

[৫৫] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ২৮।*
[৫৬] *মু'আত্তা ইমাম মালিক।*
[৫৭] *সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৭৬-৭৯।*
[৫৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা

–সাইফুল্লাহ ত্রিশালী

[২য় পর্ব]

শিক্ষকতাকে পেশা নয় সেবার চোখে দেখা

শুরুতেই আমরা জেনেছি শিক্ষকতা একটি সেবামূলক পেশা। সেবার ব্রত নিয়েই শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তবে কিছু শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সেবা দেন না। কোচিং সেন্টার খুলে বসেন। যেটা বরাবরই সমালোচনার একটি ক্ষেত্র। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের প্রায় ৬০% শিক্ষক কোচিং ব্যবসার সাথে জড়িত। তথ্যে উঠে এসেছে প্রাইভেট বিদ্যালয়ের চেয়ে এমপিওভুক্ত ও শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকগণ এ কাজে বেশি জড়িয়ে। যারা স্মার্ট বেতন-ভাতা পান। সরকারি কিছু সুবিধাও ভোগ করেন। এমন কাজ কী তাদের মানায়? অনেক অভিভাবক শিক্ষকদের এহেন কাজে বিব্রত ও বিরক্ত। প্রাইভেট না পড়লে, সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীকে বেশি নাম্বার দেয়ার অভিযোগও উঠে। পক্ষান্তরে যারা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়ে, তাদের কম নাম্বার দেয়া বা ফেল করিয়ে দেয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটে। যা খুবই দুঃজনক। সার্টিফিকেট আটকে দেয়া, ছাড়পত্র/প্রত্যয়ণপত্র দিতে গড়িমসি। দেশের নামিদামি স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ তো রীতিমতো চোখ কপালে উঠার মতো। মেধাবী শিক্ষার্থীকে সুযোগ না দেয়া। দুর্বল বাচ্চাকে উৎকোচের বিনিময়ে ভর্তি করানো। যাচ্ছে তাই ব্যাপার! মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় প্রাইভেট বাণিজ্য ও গাইড ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সবসময় শিক্ষকদের সতর্ক করছেন। অথচ গুটিকয়েক শিক্ষকের জন্য পুরো শিক্ষকজাতির বদনাম। যা মোটেই কাম্য নয়।

শিক্ষকতাকে সেবার আদর্শ রূপ দেয়ার জন্য কিছু উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য/গুণাবলী অর্জন দরকার। গুণীজনরা মনে করেন, এসব বৈশিষ্ট্য সব শিক্ষকের মাঝে থাকা জরুরী। নবম/দশম শ্রেণির পাঠ্যবই 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'তে কিছু কার্যকরী গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে নতুন শিক্ষাক্রমে এ বইটিতেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

(ক) একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই আদর্শবান হবেন। তিনি- ১. আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন; ২. নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন; ৩. উত্তম আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলবেন; ৪. কথা ও কাজে মিল রাখবেন; ৫. আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবেন; ৬. শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের পেশা ও ব্রত হিসেবে নেবেন; ৭. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করবেন ও ৮. অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন হবেন।

(খ) একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি ১. সবসময় জ্ঞানচর্চা করবেন; ২. ক্লাসে পড়ানোর জন্য আগেই প্রস্তুতি নেবেন; ৩. সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখবেন; ৪. মেধা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিবেন; ৫. বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করবেন।

(গ) একজন ভালো শিক্ষক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবেন। তিনি ১. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন; ২. শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্বরক্ষাকারী পোশাক পরিধান করবেন; ৩. বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির অধিকারী হবেন; ৪. মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন; ৫. নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কঠোর হবেন; ৬. সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হবেন।

(ঘ) একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন। তিনি ১. স্নেহ-মমতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন। ২. সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন। ৩. ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান লাভের উৎসাহ তৈরি করবেন। ৪. প্রয়োজনে একটি বিষয় বার বার বলবেন। ৫. ছাত্রদের একান্ত আপনজন হবেন। ৬. শিক্ষার্থীদের অহেতুক ধমক দেবেন না অথবা শাসন করবেন না। ৭. তাদেরকে প্রহার বা তাদের প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করবেন না; বরং দরদি মন নিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। প্রখ্যাত সাহাবি মু'আবিয়াহ্ ইবনুল হাকাম আস-সুলানি রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে বলেন, "আমি তার পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। মহান আল্লাহর কসম তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি।"[৫৯]

(ঙ) একজন ভালো শিক্ষক বিচক্ষণ হবেন। তিনি ছাত্রদের মনমেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

(চ) একজন ভালো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হবেন আন্তরিক ও দরদি। প্রশাসনের সাথে থাকবে তাঁর সুসম্পর্ক। কর্মজীবনে আমরা শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত হলে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করব এবং আদর্শ শিক্ষক হব।

আর নৈতিকতার বিষয়টি তো আরও গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। নীতিহীন ও চরিত্রহীন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

---

[59] সহীহ মুসলিম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না; কান আছে শুনে না; এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল।"[৬০]

শিক্ষাদানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি শিক্ষকগণ

১. অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ পর্যাপ্ত না থাকা, ২. বিদ্যালয়ে পাতি নেতাদের দৌরাত্ম, ৩. ক্ষমতাশীলদের খামখেয়ালী, ৪. ধনাঢ্যদের যাঁকাতলে শিক্ষকদের আদর্শ, ৫. কিছু বিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন কর্তাদের স্বজনপ্রীতি, ৬. অনেক বিদ্যালয়ের মাথামোটা কমিটি সরকারী নির্দেশনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়, ৭. সরকারি অনুদান অতিমাত্রায় গলধঃকরণের ফলে অনেক বিদ্যালয়ের দেউলিয়া অবস্থা, ৮. এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা প্রদর্শন বিদ্যালয়ের আঙ্গিনাকে দূষিত করছে, ৯. উশৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের সামাল দিতে বার বার ব্যর্থ হওয়া, ১০. নতুন ক্যারিকুলামের উপর বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা না করা, ১১. বিভিন্ন বিষয়ে অযাচিত, অনাকাঙ্খিত ভুল ছাপা –যা নিয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়ের সাথে শিক্ষকদের বাকবিতণ্ডা (সর্বশেষ, ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের বিতর্কিত গল্প 'শরীফ-শরীফা' নিয়ে দেশব্যাপী তুলকালাম কাণ্ড) অবশ্য জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এমন অযাচিত ভুল পাঠ্যপুস্তকে কেন বার বার হচ্ছে? ১২. প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা শিক্ষকদের অতিষয় ভাবাচ্ছে ইত্যাদি। অথচ ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষক আল্লামা ওয়াকি (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– "ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা।"

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি শিক্ষকগণ

সরকারি ও এমপিও প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সত্যিই মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। বিষয়টি তো এমন নয় যে, তারা যোগ্যতায় পিছিয়ে; বরং শিক্ষা সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুললে তারাই অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। এসব প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকগণ বরাবরই ত্যাগের মহিমায় নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করছেন। চরম আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যেও তারা শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দেন না। যে দেশে একজন মুচি মাসে ৩০/৪০ হাজার টাকা কামাই করেন, একজন রিক্সাওয়ালা মাসে ৩০/৩৫ হাজার টাকা কামাই করেন, একজন চা বিক্রেতা মাসে ৬০-৭০ হাজার টাকা কামাই করেন, যে শ্রমিক বকলম, জানে না– গার্মেন্টেস্-এ তারও প্রাথমিক বেতন ১৩/১৫ হাজার; সে দেশে একজন শিক্ষকের বেতন ১০-১৫ হাজার টাকা মাত্র ভাবা যায়...! ১৪/১৫ বছর পড়াশুনা করে এই বেতনে মানবতার সেবা... এটা জাস্ট সেক্রিফাইস ছাড়া কিছুই নয়। সাদাক্বায়ে জারিয়া, সুবহানাল্লাহ।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ! আপনাদের জানাই স্বশ্রদ্ধ সালাম ও উন্নত মস্তক স্যালুট। মাথামোটা বুদ্ধিজীবীদের জানা উচিত, শিক্ষকগণ যদি অর্থের কথাই চিন্তা করতেন; তাহলে তারা অন্য পেশা বেছে নিতেন। শিক্ষকতা করতেন না। তখন হয়তো স্কুলগুলোতে ছাগল মহাশয়গণ ক্লাশ নিতেন। দেশে উন্নত প্রজাতির ছাগল তৈরি হতো। গত বছর দেখেছিলাম, একটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনাম ছিল এরকম, সরকার ব্লাক বেঙ্গল ছাগল চাষের জন্য বুদ্ধিজীবীদের বিদেশে প্রশিক্ষনের জন্য পাঠাচ্ছেন। আর তাতে কয়েক কোটি টাকার বাজেট ছিল।

ইংরেজ আমলে এক বাঙালি শিক্ষক দুঃখ করে বলেছিলেন, যে জাতির শিক্ষকের বেতন লর্ড সাহেবের কুকুরের এক পায়ের সমান সে জাতির উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব?

সেই কবে সৈয়দ মুজতবা 'আলী 'পাদটিকা' শিরোনামে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষকদের বেতন প্রসঙ্গে একটি গল্প লিখেছিলেন। **কাহিনী ছিল এ রকম :** লর্ড সাহেবের একটি কুকুর ছিল যার পা ছিল ৩টি। তার পেছনে মাসিক খরচ ছিল ৭৫ টাকা। সেই হিসেবে প্রতি পায়ের খরচ ২৫ টাকা। আর সেই শিক্ষকের মাসিক বেতনও ছিল ২৫ টাকা। এত বছর পরেও সেই আনুপাতিক হিসাব আজও আমাদের দেশে চলমান। আজকাল তো তথাকথিত বড়লোকদের শিক্ষকের জন্য বাজেটের চেয়ে তাদের সন্তানদের পেম্পাসের খরচ অনেক বেশি।

একজন দিনমজুর বলছিলেন, "যে দেশে বই বিক্রি হয় ফুটপাতে আর জুতা বিক্রি হয় শোরুমে এসির ভিতরে সে দেশে পড়াশুনা কইরা কী অইব? কামলাগিরিই অইব।"

তবে যে যাই বলুক, শিক্ষা এবং শিক্ষক দেশের অমূল্য রতন। শিক্ষা ও শিক্ষক আছে বলেই দেশের মেরুদণ্ড এখনো সোজা আছে। খেলাফতের শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে তখন শিক্ষকের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়েছিল। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বেলা শেষে আমি একজন শিক্ষক : ভালোবাসা, আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্প্রীতির মহানায়ক হলেন শিক্ষক মহোদয়। শিক্ষক হলেন শি = শিষ্টাচার, ক্ষ = ক্ষমাশীল এবং ক = কর্তব্যপরায়ণ। আবার অনেকে ইংরেজি TEACHER শব্দটির বিশেষ বিশ্লেষণ করেন। এসব গুণের সমন্বয়েই আমরা টিচার। T = Truthful সত্যবাদী, E = Educated শিক্ষিত, A = Active কর্মী, C = Character চরিত্রবান, H = Honest সৎ, E = Energetic উদ্যোমী and R = Responsible দায়িত্বশীল। মহান সৃষ্টিকর্তা যদি সহায় হন তবে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা আজীবন সমুন্নত থাকবে ইন্শা-আল্লাহ। ❑

[60] সূরা আল আ'রাফ : ১৭৯।

নিভৃত ভাবনা

এক দিকে মানবতা অন্যদিকে বর্বরতা

–মো. কায়ছার আলী*

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এহুদ এলমার্ট বলেছিলেন যে, গাঁজায় ইসরাঈলী হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি শিশুর বাবার সাহায্যের আর্তনাদ শুনে তিনি চোখের পানি ফেলেছেন। চার হাজার বাড়ি ধ্বংস, বিশ হাজার বাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত, লক্ষাধিক মানুষ গৃহহারা, তেরশত লোক হত্যা, অর্থাৎ- হামাসকে নির্মূল করার নামে নিহতদের তালিকায় বেশিরভাগই ছিল নারী ও শিশু। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী হামলা স্কুল, হাসপাতাল, আন্তঃসাহায্য সংস্থার দপ্তর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোও রক্ষা পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিরাম বোমাবর্ষনে (আগুনে) উত্তর স্পেনের ছোট্ট শান্ত শহর গুয়েরনিকাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকোর বাহিনী। আর বোমার আঘাতে যারা বেঁচেছিলেন তাদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল তাদের দেহ। কালজয়ী শিল্পী পাবলো পিকাসো সেই বর্বরতাকে মুর্ত করে তুলেছিলেন গুয়ের্নিকা নামক তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মে। সেই ছবিটি দেখিয়ে ফ্রাংকোর সেনারা শিল্পীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি তুমি করেছ? উত্তরে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পিকাসো বলেছিলেন, 'না তোমরা করেছ?'

আজ রোহিঙ্গা জাতি রাখাইন বা আরাকান রাজ্যে জন্ম নেওয়া লোকদের উপর যে হারে নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ করা হচ্ছে তা তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী দেখতে পাচ্ছে। বিবেকবান মানুষ এই দৃশ্যগুলো দেখে কি শান্তিতে ঘুমোতে পারবে?

জাতিসংঘ বলছে 'জাতিগত নিধন'। আবার কেউ কেউ বলছে 'গণহত্যা'। মানব ইতিহাসে গণহত্যা কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। জাপানী কিশোরী মিস মুরাতো এবং আনাফ্রাংকের ডায়েরীর মাধ্যমে হিরোশিমা এবং নাৎসি বাহিনীর জঘন্যতম ইতিহাস পড়লে আমাদের শরীর আজও শিহরিত হয়। যদিও গণহত্যা গবেষণার বিষয়, আজও গণহত্যা হয়ে চলেছে। মৃত্যুর সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাঁচ থেকে আট কোটি, হিরোশিমায় প্রায় ৬০ হাজার, নাগাসাকিতে ৪০ হাজার। চীনের রাজধানী নানকিং এ দেড় লাখ জাপানি সৈন্যদের দ্বারা প্রায় চার হাজার লাখ চীনা হত্যা এবং হাজার হাজার নারী বলাৎকার হয়। হিটলার বাহিনী কর্তৃক ষাট লাখ ইহুদী গণহত্যার শিকার হয়। রুয়ান্ডার টাট্সী ও হুটুর মধ্যে পনের বছর প্রায় পাঁচ লাখ সংখ্যালঘু গণহত্যায় নিহত হয়। কম্পোডিয়ার বৌদ্ধদের হাতে পাঁচ থেকে সাত লাখ মানুষ গণহত্যায় মারা যায়। বেলজিয়ামের কুখ্যাত রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের হাতে কঙ্গো কিনে প্রায় এক কোটি মানুষকে ভয়াবহ অত্যাচার, অঙ্গচ্ছেদ এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৯০-এর দশকে বসনিয়াও কসোভোয় ইসলামী মনোভাবাসম্পন্ন মুসলমানদের উপর যুদ্ধ জয়ের কৌশল মনে করে কন্যা শিশুদের উপর ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায় সার্বিয় বাহিনী। আমাদের দেশেও ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গণহত্যা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা। যারা গণহত্যা চালায় তারা কখনও এটা স্বীকার করতে চায় না; বরং তারা বলতে থাকে, শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে কাজ করছে তাদের বাহিনী, যেটা আজ মিয়ানমার সরকার বলছে। স্বাধীনতা হারানো রোহিঙ্গা জাতির ভাগ্যে আজ যা হচ্ছে তা কি গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে না?

পাখি পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে, আবার পাখি মারা গেলে, পোকামাকড় পাখিকে খেয়ে বেঁচে থাকে। আইনস্টাইন ও তাঁর পরিবার এবং ইহুদীরা একসময় সারা পৃথিবীতে শরণার্থী ছিল। আজ তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এক কোটি পূর্বপুরুষ ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী ছিল। আমরাও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সম্মানের সাথে বেঁচে আছি এবং শরণার্থী রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি। এটা বাস্তবতা বা ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে উত্থান বা পতন আছে। সহজ কথায় বলা যায়, একই বৃত্তের দু'টি ফুল। তের হাজার বছর আগে প্রথম মানব বসতি বার্মায় স্থাপিত হয়। ইতিহাস ও ভূগোল বলছে রাখাইন প্রদেশে পূর্ব ভারত থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পনের'শ বছর আগে অস্ট্রিক জাতির একটি শাখা কুরুখ (Kurukh) নৃগোষ্ঠী প্রথম বসতি স্থাপন করে। ক্রমান্বয়ে বাঙালি হিন্দু (পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত মুসলিম), পার্সিয়ান, তুর্কি, মোগল, পাঠান এবং অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর বসতি স্থাপন করেছে।

এসব নৃগোষ্ঠী সংকরজাত জনগোষ্ঠীই হলো এই রোহিঙ্গা। বস্তুত রোহিঙ্গারা হলো আরাকান বা রাখাইনের একমাত্র ভূমিপুত্র জাতি। আরাকানের প্রাচীন নাম রূক্ষ জনপদ, বর্তমানে রাখাইন। রাখাইন শব্দ এসেছে পালি শব্দ রাক্ষপুরা থেকে, যার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো রাক্ষসপুরা। অর্থাৎ- রাক্ষসদের আবাসভূমি। প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রাদিতে অষ্ট্রিক (অষ্ট্রালয়েড) মহাজাতিকে রাক্ষস জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো– মগ জাতির কিন্তু অষ্ট্রালয়েড

---

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

মহাজাতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তারা মঙ্গোলয়েড মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত জাতি। বর্তমান আরাকান মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বঙ্গোপসাগর এবং নাফ নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম মোহনা বেষ্টিত আরাকান-ইয়োমা নামে দীর্ঘ পর্বত শৃঙ্গ আরাকানকে মিয়ানমারের অন্য অংশ থেকে আলাদা করেছে। ১৭৩১ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে আরাকান রাজ্যকে তেরজন রাজা শাসন করেন এবং এ রাজ্যদের গড় শাসনকাল দুই বছরের বেশি ছিল না। ১৭৮৪ সালে বোদাউপায়ার সময়ে আরাকান রাজ্য বার্মা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ১৮২৬ সালে এটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অংশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এটি সাময়িকভাবে জাপানের দখলে ছিল। ১৮৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল তখন আরাকানের মুসলিম নেতারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাদের পাকিস্তানের সাথে একীভূত করতে আগ্রহ দেখাননি। ব্রিটিশরা বার্মার স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একশ ঊনচল্লিশটি জাতি গোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করলেও তখন ঐ তালিকায় রোহিঙ্গাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এটা ব্রিটিশদের ইচ্ছাকৃত ভুল নাকি অপকৌশল, প্রশ্ন রয়েই যায়।

আরাকানের মুসলমানদের একাংশের নেতা কাশেম রাজা তাদের জাতিগত অধিকার প্রশ্নে বিদ্রোহ করেন। তবে তা সার্থক হয়নি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চলে এসে কারারুদ্ধ হন। তখন রোহিঙ্গারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। বর্মী সরকার অভিযোগ উত্থাপন করে যে, রোহিঙ্গারা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সদ্য অভিবাসিত একটি উপজাতি। অতএব তাদের স্থানীয় আদিবাসী গণ্য করে বর্মী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বার্মার নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী বার্মার নাগরিকত্ব দেওয়া যায় না। মূলত বার্মার প্রকৃত নাগরিক না হওয়াটাই রোহিঙ্গাদের বার্মা থেকে বের করে দেওয়ার মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়। যদিও মিয়ানমারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজনীতি করেনি। বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারে দুই নারীসহ ১৭ জন রোহিঙ্গা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সরকারের সচিবসহ শীর্ষ পদেও আসীন ছিল রোহিঙ্গারা।

১৯৯০ সালের নির্বাচনেও পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের চারজন প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেওয়া হয় ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন বাস্তবায়নের নামে। নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের ভোটাধিকার হরণ করে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। বার্মার স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পূর্বে সেনাবাহিনীর কমান্ডার ও প্রতিষ্ঠাতা সূচির পিতা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীসহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ১৯৬২ সালের ২ মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল নে উইন বার্মার ক্ষমতা দখল করেন। সেই সামরিক জান্তাও সূচিকে দীর্ঘ পনের বছর গৃহবন্ধী বা কারারুদ্ধ করে রাখেন। সামরিক জান্তা তখন থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তাদের দমন এবং বিতাড়ন শুরু করেন।

১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সূচি ভবিষ্যতে যেন ক্ষমতার ভাগ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন সেজন্য ২০০৮ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন চারভাগের একভাগ (উভয় কক্ষের) তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত, বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করলে এবং তার সন্তান অন্য দেশের নাগরিক হলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তিনটি মন্ত্রণালয় (স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত বিষয়ক) সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের চেয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেশি। দেশটির গণতান্ত্রিক সরকারকে সাসপেন্ড করার ক্ষমতা ন্যাশনাল ডিফেন্স অফ সিকিউরিটি কাউন্সিলের। যেটির ১১টি আসনের ৬টি তেই আবার সেনাবাহিনী নিয়োগকৃত। একটি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন চার ভাগের তিন ভাগ আসন। বেসামরিক সরকার একাট্টা হলেও সামরিক বাহিনীর সমর্থন প্রয়োজন। সূচি রোহিঙ্গা নির্যাতনে চুপ করে থাকা অথবা নিজে পদত্যাগ করা ছাড়া আর বেশিকিছু করতে পাবেন বলে আমার মনে হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে ইতিহাস বারবার ফিরে আসে। ১৯৭১ সালে ইন্দ্রিরা গান্ধি এবং ভারতের জনগণের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের জনগনের মহানুভবতা বা উদারতার মিল রয়েছে যা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। কারণ তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল, আমরা ও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছি। রোহিঙ্গাদের শরণার্থী সংখ্যা ৫ লাখের বেশি, দিনে দিনে সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মায়ানমারের বর্বরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানবতা আমাদেরকে বিশ্ব মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করছে। কেউ বলছে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার, কেউ চাইছে সেইফ জোন, কেউ দিচ্ছে আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য-সহযোগীতা। কফিআনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মুহূর্তে কেনই বা রোহিঙ্গারা (বা অন্য কেউ) একযোগে পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করল? এতে চিন্তাশীল মানুষেরা ধাঁধাগ্রস্থ হয়েছে কিন্তু যুক্তিহীন হয়নি। রোহিঙ্গাদের ফেরত দিয়ে কফিআনান কমিশনের রিপোর্টের আপাতত বাস্তবায়ন চাই। যে রিপোর্টে রয়েছে রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ, অবাধ চলাচলে স্বাধীনতা এবং নাগরিকত্ব প্রদানসহ ইত্যাদি ইত্যাদি। ❑

কিশোর ভুবন

বারবার প্রশ্ন তারপরে...

–মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার★

আমরা তো পাঠশালা যেয়ে কত দুষ্টামি করি। খেলাধুলা করি, হৈ-হুল্লোড় করি। ক্লাস ফাঁকা পেলেই গালগল্প জুড়ে দিই। শিক্ষক ক্লাসে আসার পরেও তার চোখ ফাঁকি দিয়ে কতশত দুষ্টামি করি। যেগুলো কেউ হয়ত জানতেও পারে না। শিক্ষক বারবার বলেন, মনোযোগ দিয়ে বই ধরতে কিন্তু আমরা পাশের জনের সাথে চুপিসারে গল্প করতে মজে থাকি। কে শুনে কার কথা? আবার কখনো যদি শিক্ষক বলেন, আজকে অনেক পড়াব কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না তখন আমরা বারবার প্রশ্ন করে পড়ানোর গতি মন্থর করে দিই। শিক্ষক আমাদের এসব দুষ্টামি ধরে ফেলার পরেও কখনো ছাড় দেন আবার কখনো ভালোবাসা মিশিয়ে হালকা করে বকা দিয়ে আবার পড়ানো শুরু করেন। আবার কখনো কখনো অজানাকে জানার জন্য আমাদের মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে যার কারণে শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বারবার প্রশ্ন করে বসি। ভুলে যায় শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞার কথা।

বন্ধুরা চলো এরকমই একটি গল্প শুনে আসি আজকে। গল্পটি অনেক পুরোনো হলেও বেশ মজার। শিক্ষক তার শাগরেদকে বারবার করে বলে দিলেন যে, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না কিন্তু না, ছাত্রের সে কথা মনেই থাকে না। যার কারণে বার বার প্রশ্ন করে বসে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ছাত্রের ব্যাপারে? চলো আমরা শুনে আসি আমাদের প্রিয় রাসূলের মুখনিঃসৃত বাণী থেকেই।

রাসূল (ﷺ) বলেন, বানী ইস্‌রাঈলের জনগণের সামনে মূসা (আলাইহিস সালাম) একদিন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি অকপটে বলে ফেলেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করেননি (অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা সবচাইতে বড় জ্ঞানী এ কথা বলেননি)।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠান, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এক বান্দা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আছে। সে তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী।

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন : হে আমার প্রতিপালক! আমি কী উপায়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব? আল্লাহ তা'আলা বলেন : তুমি থলেতে একটি মাছ নাও। মাছটি যেখানে হারিয়ে ফেলবে, সেখানেই সে আছে।

অতএব তিনি রওনা হলেন এবং ইউশা' ইবনু নূন নাম্নী তাঁর যুবক শাগরিদও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) থলের মধ্যে একটি মাছ ভরে নিলেন। তাঁরা দু'জনে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে একটি প্রকাণ্ড পাথরের নিকট (সমুদ্রের তীরে) এসে পৌঁছেন। এখানে দু'জনই শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। থলের মধ্যকার মাছটি জীবিত হয়ে নড়াচড়া করতে করতে সমুদ্রের পানিতে পতিত হলো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মাছটি দিয়ে পানির স্রোতধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা প্রাচীরবৎ হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য এভাবে একটি পথের ব্যবস্থা হলো। মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর যুবক সঙ্গীর নিকট এটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছিল। তাঁরা দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতে অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁর সঙ্গী মাছের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে জানাতে ভুলে গেল। ভোর হলে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গীকে বললেন,

"আমাদের সকালের নাশতা নাও। আজকের সফরে আমরা অত্যাধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"[৬১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : তাদেরকে যে স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁরা ক্লান্ত হননি। কিন্তু নির্দেশিত স্থান পার হওয়ার পরই তাঁদেরকে ক্লান্তিতে পেয়ে বসে।

"যুবক বলল, আমরা যখন সেই প্রস্তরময় প্রান্তরে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছে তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি আপনার নিকট তা উল্লেখ করতেও ভুলে গেছি।

★ *মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৬১] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৬২।*

মাছ তো আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে। মূসা বললেন, আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম।"[৬২]

তারপর তাঁরা দু'জনেই তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে আসেন।

সুফ্ইয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কিছু লোকের ধারণা যে, এই প্রস্তরময় ময়দানে (বা সমুদ্র তীরেই) আবে হায়াতের ঝর্ণা রয়েছে। এই পানি মৃত ব্যাক্তির উপর ছিটিয়ে দিলে সে জীবিত হয়ে উঠে। এই মাছের কিছু অংশ খাওয়াও হয়েছিল। ঐ ঝর্ণার পানির ফোঁটা মাছের গায়ে পড়লে সাথে সাথে মাছটি জীবিত হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : তাঁরা উভয়ে তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে পূর্বের সেই প্রান্তরে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর লম্বা করে গায়ে দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন।

মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আমাদের এ জায়গায় তো সালামের প্রচলন নেই (তুমি মনে হয় একজন আগন্তুক)? তিনি বললেন, আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)।

তিনি প্রশ্ন করলেন, বানী ইস্রাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার নিকট আল্লাহর দানকৃত এক বিশেষ জ্ঞান আছে। আমি তা জানি না। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এক বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন যা আপনি জানেন না। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন :

"আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শিখার উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার সাথে থাকতে পারি? তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করেই বা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন? তিনি বললেন, ইন্শা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। কোনো ব্যপারেই আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করব না।"[৬৩]

খাযির (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সাথে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার নিকট কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ আমি আপনাকে তা না বলি।"[৬৪]

তিনি (মূসা [আলাইহিস সালাম]) বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে।

খাযির ও মূসা (আলাইহিস সালাম) সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হেঁটে চলতে থাকলেন। তাদের সামনে দিয়ে একটি নৌকা অতিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের সাথে কথা বললেন এবং তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারা খাযিরকে চিনে ফেলল এবং কোনো ভাড়া ছাড়াই তাদের দু'জনকে নৌকায় তুলে নিল। খাযির নৌকার একটি তক্তা খুলে নিলেন।

তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, লোকেরা আমাদেরকে ভাড়া ছাড়াই নৌকায় তুলে নিলো, আর আপনি নৌকাটির ক্ষতি সাধন করলেন! আপনি কি তাদের ডুবিয়ে দিতে চান?

"আপনার এ কাজটি খুবই আপত্তিকর। খাযির বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন না।"[৬৫]

তারা নৌকা হতে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। পথিমধ্যে দেখা গেল, একটি বালক অপর কয়েকটি বালকের সাথে খেলাধুলা করছে। খাযির (আলাইহিস সালাম) নিজের হাতে ছেলেটির মাথা ধরে তা ঘাড় হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং এভাবে তাকে হত্যা করেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, "একটা নিষ্পাপ বালককে আপনি মেরে ফেললেন! অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন। খাযির বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না?"[৬৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : পূর্বের কথার চেয়ে এ কথাটা বেশি শক্ত ছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, "অতঃপর আমি যদি আপনার নিকট কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মতো ত্রুটি আপনি আমার মধ্যে পেয়েছেন। পুনরায় তাঁরা দু'জনে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যেতে যেতে একটি জনপদে এসে পৌঁছলেন এবং

[৬২] *সূরা আল কাহ্ফ : ৬৪।*
[৬৩] *সূরা আল কাহ্ফ : ৬৬-৬৯।*
[৬৪] *সূরা আল কাহ্ফ : ৭০।*
[৬৫] *সূরা আল কাহ্ফ : ৭১-৭৩।*
[৬৬] *সূরা আল কাহ্ফ : ৭৪-৭৫।*

সেখানকার মানুষদের নিকট খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা মেহমান হিসেবে তাদের মেনে নিতে রাজী হয়নি। তাঁরা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।"[৬৭] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির তাঁর হাত দিয়ে দেয়ালটি ঠিক করে দিলেন।

মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন : আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যারা আমাদেরকে মেহমান হিসেবেও গ্রহণ করেনি বা আহারও করায়নি। "আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের জন্য মজুরী নিতে পারতেন। খাযির বললেন, ব্যাস! এখানেই তোমার ও আমার একত্রে ভ্রমন শেষ। তুমি যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারনি, এখন আমি তোমাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য বলে দিব।"[৬৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)- এর উপর রহমাত অবতীর্ণ করুন। আমাদের আশা ছিল যে, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন তাহলে আমাদেরকে তাদের এসব বিষয়ের তথ্য জানানো হত! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : মূসা (আলাইহিস সালাম) শর্তের কথা ভুলে যাওয়ার কারণেই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন। তিনি আরো বলেন : একটি চড়ুই পাখি এসে তাদের নৌকার কিনারে বসে, তারপর তা সমুদ্রে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়।

তখন খাযির তাঁকে (মূসা [আলাইহিস সালাম]) বললেন, এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের পানি যতটুকু কমিয়েছে, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানভাণ্ডার হতে ঠিক ততটুকুই কমিয়েছে।[৬৯]

মূসা (আলাইহিস সালাম) খাযির (আলাইহিস সালাম)-কে যে প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলোর সমাধান হলো– নৌকাটির ব্যাপার এটা ছিল কিছু দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সাগরে কাজ করত; আমি ইচ্ছে করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা যে বল প্রয়োগ করে প্রত্যেকটি ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিত।[৭০]

আর কিশোরটির পিতামাতা ছিল মু'মিন। অতঃপর আমরা আশংকা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফ্‌রীর দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। 'তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর'।[৭১]

আর ঐ প্রাচীরটি ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতিম কিশোরের এবং এর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারনে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।[৭২]

গল্প থেকে শিক্ষা :

১. নিজেকে সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী মনে না করা।

২. প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে জানা না থাকলে আল্লাহ তা'আলা আ'লাম বা মহান আল্লাহই সবচাইতে ভালো জানেন বলা।

৩. ব্যক্তি যতই সৎ হোক না কেনো ভুলে যাওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

৪. ব্যক্তি যতই জ্ঞানী হোক তারপরো আরো বেশি জ্ঞানার্জন করা মুস্তাহাব।

৫. মাদ্‌রাসায় ছাত্র ভর্তি নেওয়ার সময় তার থেকে অঙ্গীকার নেওয়া বৈধ।

৬. সফরে কাউকে সঙ্গী হিসেবে নেওয়া মুস্তাহাব। যেমন- মূসা (আলাইহিস সালাম) ইউসা' (আলাইহিস সালাম)-কে সাথী হিসেবে নিয়েছিলেন।

৭. সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কোনো দূর দেশে ভ্রমণ করতে হয় তবে তা-ই করতে হবে।

৮. শিক্ষকের সাথে ভদ্রতা বজায় রাখা। কখনো ভুল বা বেয়াদবী হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নেয়া।

৯. কেউ মেহমান হলে তাকে আপ্যায়ন করানো ওয়াজিব।

১০. কোনো বিষয় বাহ্যিকভাবে দেখেই হুকুম না দিয়ে বরং একটু রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা। ❑

---

[৬৭] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৭৬-৭৭।*
[৬৮] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৭৭-৭৮।*
[৬৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪০১; সহীহ মুসলিম- হা. ৬০৫৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩১৪৯।*
[৭০] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৭৯।*
[৭১] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৮০, ৮১।*
[৭২] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৮২।*

আলোকিত ভুবন

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে 'বিশ্ব বই দিবস'-এর গুরুত্ব

–এম এ মতিন*

ভূমিকা : ২৩ এপ্রিল। 'বিশ্ব বই দিবস'। দিবসটির এবারকার প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'রিড ইউর ওয়ে' অর্থাৎ- 'পড়ুন আপনার মতো করে'। ১৯৯৫ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছর বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। 'বিশ্ব বই দিবস'র মূল উদ্দেশ্য হলো– বই পড়া, বই প্রকাশ, বই এর ব্যবহার বৃদ্ধি, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

'বিশ্ব বই দিবস'-এর পটভূমি

১৯৯৫ সালে প্রথমবার 'বিশ্ব গ্রন্থ দিবস' পালিত হলেও তখন আলাদাভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি গ্রন্থস্বত্বকে। ২০০১ সালে, বই বিক্রেতা, প্রকাশক এবং বিশ্বের নানান প্রান্তের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সমিতির অনুরোধে 'বই দিবস'-এর সঙ্গে 'গ্রন্থস্বত্ব'- শব্দটি জুড়ে দেয় ইউনেস্কো। সেইসঙ্গে ঠিক হয় প্রতিবছর বিশ্বের 'গ্রন্থ রাজধানী' হিসাবে বেছে নেওয়া হবে একটি করে শহরকে। ২০২৪ সালের জন্যে 'গ্রন্থ রাজধানী' হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের দেশ ঘানা'র রাজধানী 'আক্রা'কে।

১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিশ্ব বই দিবস'র যাত্রা শুরু হলেও মূল ধারণাটি আসে প্রায় ৪০০ আগে ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি হলো– ঐ দিন স্পেনের বিখ্যাত কবি ও লেখক মিগেল দে সার্ভান্তেস মারা যান। ভিসেন্ট ক্লাভেল আন্দ্রেস ছিলেন তার ভাবশিষ্য। আধুনিক স্পেনিশ সাহিত্যের হাতেখড়ি হয় তার সার্ভান্তেসের হাত ধরেই। কিংবদন্তি এই কবির মৃত্যু দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে, আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে, ১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল দিনটিকে 'গ্রন্থ দিবস' হিসাবে উদযাপন স্পেনিশ কথাসাহিত্যিক ভিসেন্ট ক্লাভেল আন্দ্রেস। শুধু সার্ভান্তেজ নয়, ২৩ এপ্রিল কিংবদন্তি ইংরেজ নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারেরও মৃত্যুদিন। পাশাপাশি এপ্রিলের ২৩ তারিখেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলম্বিয়ান লেখক ম্যানুয়েল মেইয়া এবং স্পেনিশ পেরুভিয়ান লেখক ইনকা গার্সিলাসু ডেলা ভেগা-সহ একাধিক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ঘটনাচক্রে আজকের তারিখেই প্রয়াত হয়েছিলেন ভারতের সুখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো স্পেনের এক প্রস্তাব অনুযায়ী ২৩ এপ্রিলকে' বিশ্ব বই দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে "বিশ্ব বই দিবস" পালনের গুরুত্ব

বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পর্যায়ে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হলেও ২৩ এপ্রিল 'বিশ্ব বই দিবস' পালনের নজির নেই। বিচ্ছিন্নভাবে ১/২টি পত্রিকা এ বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে থাকে। 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' এবং 'বিশ্ব বই দিবস'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই।

দেশের সকল স্তরের মানুষকে বিশেষ করে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা, জাতিগঠনে গ্রন্থাগারের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা, দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর সর্বশেষ প্রকাশিত বই ও সাময়িকীর তথ্যাদি সংগ্রহ, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও মতবিনিময়, মননশীল সমাজ গঠনে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং পাঠক তৈরির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং গ্রন্থাগারকর্মী ও পেশাজীবী, লেখক, প্রকাশক, পাঠক বিশেষ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় ৫ ফেব্রুয়ারীকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের দাবি, একই উদ্দেশ্য (ইউনেস্কো কর্তৃক নিরূপিত) সামনে রেখে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সরকার 'বিশ্ব বই ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস' পালনের উদ্যোগ নিতে পারেন।

সরকার আগামীর বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। স্মার্ট বাংলাদেশ'র অর্থ হচ্ছে দেশের

* *উপদেষ্টা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রক্টর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ এবং প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা।*

প্রত্যেক নাগরিক প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে, ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি, যাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে করতে হবে। ই-এডুকেশন, ই-হেলথসহ সবকিছুতেই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নির্ণীত শর্ত চতুষ্ঠয়ঃ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি বিশ্বখ্যাত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখেই প্রণীত বলে প্রতীয়মান হয়। তবে শর্ত চতুষ্ঠয় প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত যে স্মার্ট এডুকেশন এবং স্মার্ট লাইব্রেরী এবং বই এর প্রতি একনিষ্ঠ মনোনিবেশ সে কথা বলাই বাহুল্য। অতএব আমাদের জন্যে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' এবং 'বিশ্ব বই দিবস' যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে জাতিকে বইমুখী করার বিকল্প নেই। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের পাশাপাশি মুদ্রিত বই পাঠেও ছাত্র শিক্ষক গবেষকসহ সকল শ্রেণির নাগরিক কে উদ্বুদ্ধ করেত হবে। 'বিশ্ব বই দিবস' পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানেই।

সংশ্লিষ্ট সবাই বিশ্বাস করেন যে, 'বিশ্ব বই দিবস' পালনের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক সবাই বই পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন এবং নিজেদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নততর ফলাফল অর্জন করবেন এবং সার্বিকভাবে জীবন মানের উন্নতি ঘটাবেন। বলা দরকার যে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নের এজেন্ডা মাথায় রেখে আমরা যদি অগ্রসর হতে চাই তাহলে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির আর কোনো বিকল্প নেই।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ 'ত্রিংশতিতম 'বিশ্ব বই দিবসে' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের গ্রন্থাগার ও শিক্ষার মান পর্যালোচনার সময় এসেছে। আমরা জানি, যে জাতির গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। আমরা এও জানি যে, বর্তমান যুগে কোনো জাতির উন্নয়নের ব্যারোমিটার বা পরিমাপক যন্ত্র হচ্ছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের পরিমান, অর্থাৎ- যে জাতি যত বেশি পরিমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহার করে সে জাতি তত বেশি উন্নত। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের বর্তমান মানদণ্ড হচ্ছে বৈশ্বিক জ্ঞান সূচক, বৈশ্বিক অর্থনীতি সূচক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বৈশ্বিক র‍্যাংকিং।

বিগত ১২-১৩ বছরে দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদনশীলতা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাত, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ্য হয়েছে। ফলত ২০১৫ সালে বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের তালিকায় নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছে। আশা করা যায়, প্রয়োজনীয় সকল চলকে [গ্রস ন্যাশনাল ইনডেক্স (জিএনআই), হিউম্যান এসেটস ইনডেক্স (এইচএআই) এবং ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স (ইভিয়াই)] ঈপ্সিত ফলাফল অব্যাহত রাখতে পারলে ২০২৬ সাল থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে স্বীকৃত হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতেই নয় বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে, উল্লেখিত সময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্‌রাসা, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভুত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলদেশকে ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও শিক্ষার মানের আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে খারাপ করে চলেছে। এই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে বাংলাদেশ।

মাত্রতিরিক্ত ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের অপকারিতা

প্রযুক্তির কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সমাজে বই পড়ার অভ্যাসটা কমেছে দারুনভাবে। এখন সবার চোখ বই এর স্থলে থাকে মোবাইলের স্ক্রীনে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক ১২ কোটি ৬১ লাখের বেশি। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গ্রাহক বেড়েছে ২০ লাখ। এর মধ্যে বিরাট অংশ তরুণ। বাংলাদেশে ১৫ থেকে ২৯ বয়সী মানুষ আছে প্রায় ৩ কোটি। এদের অধিকাংশই ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইমো ও লাইকিসহ আরো অনেক ধরণের ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তরুণরা গড়ে দৈনিক ৪-৫ ঘন্টা সময় এ সকল ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যয় করে।

১৯৯৫ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্য যাদের জন্ম, তাদের 'আইজেন' বলা যায়। এ প্রজন্ম স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম সম্বল করে বেড়ে উঠেছে। তাদের আচরণ ও আবেগের ধরন আগের প্রজন্মের চেয়ে আলাদা। আইজেনের এ পরিবর্তনে মানসিকভাবে তারা বেশি ঝুঁকিতে আছে। তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা ২০১১ সাল থেকে বাড়তে দেখা গেছে। গত কয়েক

দশকের মধ্যে 'আইজেন' সবচেয়ে বেশি মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে এখন। তারা শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই আলাদা নয়, তাদের সময় কাটানোর ধরনও আগের চেয়ে আলাদা। প্রতিদিন তারা ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা ও চমক চায়। একই ছাদের নিচে মা-বাবার সঙ্গে থেকেও মা-বাবার কাছ থেকে আগের প্রজন্মের চেয়ে অনেকটাই দূরে আইজেনরা। মা-বাবার সঙ্গে এখনকার তরুণেরা কথা বলে কম। তাদের বলতে শোনা যায়, 'ওকে', 'ঠিক আছে' জাতীয় সংক্ষিপ্ত উত্তর। এমনকি বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তাদের ফোনে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। পরিবারের সদস্যদের দিকে মন থাকে কম। তারা বিছানায় শুয়ে-বসে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখে। দ্য আটলান্টিকের এক প্রতিবেদনে এ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর স্মার্টফোনের প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনকার কিশোররা বন্ধুর সান্নিধ্যে কম সময় কাটায়, তাদের মধ্যে ডেটিং কমছে, এমনকি পুরো প্রজন্মের ঘুম কম হচ্ছে। একাকিত্বের এই হার বাড়ায় সাইবার নিপীড়ন, হতাশা, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। 'হ্যাভ স্মার্টফোনস ডেস্ট্রয়েড আ জেনারেশন' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে 'আইজেন' প্রজন্মের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার অধ্যাপক জিন টুয়েঙ্গে।

এছাড়া সম্প্রতি আর এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু-কিশোররা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি ধাবিত হচ্ছে অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে। প্রযুক্তির এমন অপব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। অনেকটা বাধ্য হয়ে অনেক অভিভাবক সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোন অথবা ডিজিটাল ডিভাইস। অভিভাবকরা বলছেন, এই ধরনের প্রযুক্তিগুলোতে তারা এতটাই আসক্ত যে তাদের যদি কোনোকিছু প্রয়োজন হয়, আর সেটিতে বাধা দিলে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে। প্রযুক্তির দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে বই পড়ার অভ্যাসটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যে জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেটি পুঁজিবাদী সমাজের একটি অংশ। মূলত মুনাফার জন্য এ নতুন সংস্কৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। যা তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পারিবারিকভাবে তাদের সামনে উন্নত আদর্শ তুলে ধরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে তরুণদের মুদ্রিত পাঠসামগ্রীর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে এসব অপরাধ থেকে আইজেন প্রজন্মকে বিরত রাখা সম্ভব।

আজকের পৃথিবীতে স্ক্রিন আসক্তি বা নেট আসক্তিকে তুলনা করা হচ্ছে জীবনগ্রাসী মাদকাসক্তির সঙ্গে। বিশ্বজুড়ে বাঘা বাঘা প্রযুক্তি বিশ্লেষক প্রযুক্তি আসক্তির অশনিসংকেত দিচ্ছেন জোরালোভাবে। প্রযুক্তির কল্যাণকর দিকগুলো অবশ্যই অস্বীকার করা যাবে না। সকাল থেকে বিছানায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবেই প্রযুক্তির কল্যাণকর দিকগুলো গ্রহণ করছি। তবে নিজেদের অজান্তেই কিছু অকল্যাণকর দিকেও জড়িয়ে ফেলছি নিজেদের। এখন সময় এসেছে এর অকল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার।

দারুণ সুকৌশলে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আমাদের তরুণ-তরুণীদের মগজ ধোলাই করে তাদের সবটুকু মনোযোগ কেড়ে নিয়ে নিবদ্ধ করছে প্রতিদিনকার পোস্ট, লাইক, শেয়ার আর কমেন্টে। যেন জীবনের গণ্ডি আঙুলের ছাপের কিছু লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট সেকশনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো তরুণ সমাজের যেমন উপকার করছে, তেমনি তাদের নিজেদের অজান্তে তাদের ঠেলে দিচ্ছে কিছু অন্ধকার দিকে। সোশ্যাল মিডিয়া তরুণ সমাজে যেসব ক্ষতি ডেকে আনছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে– সামাজিক নিঃসঙ্গতা, সৃজনশীলতা হ্রাস, সক্রিয়তা হ্রাস, অস্বাভাবিক আচরণ, জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়া, ইত্যাদি।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি তীব্র টান তরুণ-তরুণীদের বাধ্য করছে একটানা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকতে। অর্থহীন সময় কাটছে তাদের। প্রোডাকটিভ কিছুতেই তারা মনোনিবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাদের চিন্তাশক্তি আর কর্মশক্তি চলে যাচ্ছে অন্যের দখলে। তাই একসময় এসে তারা নিজেদের নিষ্ক্রিয় জড়বস্তু হিসেবে খুঁজে পাচ্ছে।

হয়তো সেই দিন আর বেশি দূরে নয়, যখন মাদকাসক্তি নিরাময়ের মতো করে স্ক্রিন বা নেট বা সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির জন্যও নিরাময় সেন্টার খুলতে হবে। খুঁজতে হবে কার্যকর সমাধান। তাই আসুন বেলা ফুরাবার আগেই সচেতন হই, যেন সোশ্যাল মিডিয়া নয়; বরং আমরাই সোশ্যাল মিডিয়াকে নিজেদের প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। স্ক্রিন আসক্তির বাস্তব যে কুফল তা আমাদের 'আইজেন'দের লেখাপড়ার বর্তমান অবস্থা ও পরীক্ষার ফলাফল দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। গত কয়েক বছর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯০% অকৃতকার্য হচ্ছে। এই ফলাফল পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের বই এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যেনতেনভাবে তারা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আসলেও নকলবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তাদের লেখাপড়ার আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে যায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। সুতরাং এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। আর এর একমাত্র পথ হচ্ছে– তরুণ-তরুণীদের সামনে স্ক্রিনের বিকল্প মুদ্রিত পাঠসামগ্রী উপস্থাপন।

বই পড়ার গুরত্ব ও উপকারীতা

শরীর সুস্থ রাখার জন্য যেমন স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন, ঠিক তেমনিভাবেই ব্রেন তথা মস্তিষ্ককে সুস্থ, কার্যক্ষম ও সচল রাখার জন্য খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা জানাচ্ছে, বই পড়ার অভ্যাসটিই হলো মস্তিষ্কের খাদ্য! পুস্তক পাঠ স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। বই পড়া ব্রেনের জন্য ভীষণ উপকারী।

গবেষণা থেকে দেখা গেছে, বই পড়ার অভ্যাসের ফলে মস্তিষ্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়। মানসিকভাবে সবসময় উদ্দীপ্ত থাকার ফলে ডিমেনশিয়া ও আলঝেইমারকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। কারণ, মস্তিষ্ক সব সময় অ্যাকটিভ থাকার ফলে, তার কর্মক্ষমতা হারানোর সম্ভবনা কমে যায়।

এছাড়া বই পড়া মানসিক চাপ কমায়, স্মৃতিশক্তি প্রখর করে, বৃদ্ধি পায় কল্পনাশক্তি, যৌক্তিক চিন্তায় দক্ষ হওয়া যায়, মনোযোগ বৃদ্ধি করে, রাতে দ্রুত ঘুমাতে সাহায্য করে, কোনো বিষয়ে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, বৃদ্ধি পায় সৃজনশীলতা।

আজকাল মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করা যায়। কোনো আড্ডা বা মজলিশে বই কিংবা শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠে না। দর্শন, বিজ্ঞান, লেখালেখি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয় না। আড্ডার বিষয়বস্তুতে প্রধান হয়ে উঠে রাজনীতি, প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব আর নিত্য নতুন পোশাক ও জুয়েলারির আলাপ। এছাড়াও বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্য্য, যশ, প্রাচুর্য আর বিত্তের প্রচার ও প্রকাশে অনেকেই অস্থির! সেই সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় কায়ক্লেশে থাকা জীবনেও এমন সব পোষ্ট বা ছবি ছড়িয়ে দিচ্ছে, যেসব খুব বিভ্রান্তিকর। এইসব বিভ্রান্তিমূলক কাণ্ড কমিয়ে তারা যদি বই পড়ায় একটু মনোযোগী হতো তাহলে সমাজটা বোধহয় আরেকটু সভ্য হতো!

অযোচিত প্রদর্শনীর এই মহামারী নিরাময় করতে পারে বই। অথচ এখন উপহার হিসেবেও মানুষ আর বই আদান-প্রদান করে না। পরস্পর পরস্পরকে বাহারী শাড়ি, জুয়েলারি, ঘর সাজাবার সামগ্রী কিংবা যা কিছুই উপহার দিক না কেন বই অন্তত এই তালিকায় নেই।

শুদ্ধ চিন্তার বিকাশে বই পড়া একটি অত্যান্ত গুরত্বপূর্ণ অভ্যাস। বিভিন্ন ইলেক্ট্রোনিক্স ডিভাইস থেকে নিজেকে একটু অন্য দিকে ফেরাতে বই বিশেষ ভূমিকা রাখতে সহায়ক। আমরা আবার যদি সে অভ্যাসটা ফিরিয়ে আনতে পারি সেটা আমাদের শারীরিক ও মানসিক দু'দিকেই লাভজনক। বই কেনার অভ্যাসে শোকেসে কিংবা ঘরে রেখে দিলেও কোনো এক অবসন্ন সময়ে হয়তো হাতে নিতে ইচ্ছে করবে। অপরের ভাবনাগুলো নিজের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। এটি করতে পারে একমাত্র বই ও বই পড়ার বিগত অভ্যাস ফিরিয়ে আনা। 'বিশ্ব বই দিবস' থেকেই না হয় শুরু হোক এর মূল্যায়ন!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউসিএলএ সেন্টার ফর ডিসলেক্সিয়ার ডিরেক্টর বলেন, 'ভাষা শেখা কিংবা কোনো কিছু লেখার চাইতেও বই পড়ার সময় একজন পড়ুয়া অনেক বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন। যা তাকে কাল্পনিক জগতে বিস্তৃতভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়, চিন্তার নতুন অনেক দ্বার খুলে দেয়। এতে করে ভাষা শেখার চাইতেও অনেক বেশি উপকৃত হয় মস্তিষ্ক'। আরও দারুণ বিষয় জানাচ্ছে ইমোরি ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটির এক গবেষণাকর্মের তথ্য থেকে দেখা গেছে, বই পড়ে শেষ করার পাঁচ দিন পরেও মস্তিষ্কে তার কার্যকারিতা চলতে থাকে। শারীরিক কোনো কাজের কথা পড়ার সময় নিউরন সেরূপভাবে কাজ করা শুরু করে। এক্ষেত্রে দায়ী হলো মোটোর নিউরন ফাংশন। বলা যেতে পারে, বই পড়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কের দারুণ ব্যায়ামও হয়ে থাকে। বই পড়ার ফলে যে ভালোলাগার অনুভূতি কাজ করে, তা তুলনাহীন। বইপড়ুয়া মানুষেরা জানেন, এক একটা বই কতটা ভালোবাসার ও প্রিয় হতে পারে। প্রিয় বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, ভালো সময় কাটানোর অনুভূতিগুলো যেন পৃথিবীর অন্যান্য সকল অনুভুতির কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

শুধু মানসিক নয়, শারীরিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে বই পড়ার অভ্যাস। এমনকি খোলা কোনো স্থানে হাঁটা কিংবা

পছন্দের কোনো গান শোনার চাইতেও, মানসিক চাপ কমাতে বই পড়া বেশি উপকারী। প্রতিবার নতুন এক একটি বই পড়ার সময়, পাঠককে গল্পের অনেকগুলো চরিত্র, গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড, গল্প ও চরিত্রের ইতিহাস, প্রতিটি চরিত্রের ক্যারেক্টারিস্টিক, গল্পের সাব-প্লট সহ আরও অনেক কিছুই মনে রাখতে হয়। কারণ, বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় গল্প মোড় নিতে থাকে। এই সকল কিছু ভালোভাবে মনে না রাখলে বইটাই তো বুঝা যাবে না। একইসঙ্গে অনেককিছু মনে রাখার অভ্যাসের সঙ্গে স্মৃতিশক্তি প্রখর হতে থাকে। বইয়ের কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে ও কাল্পনিক ঘটনার ভেতর ডুবে যেতে চাইলে নিজেকেও হারিয়ে ফেলতে হয় সেই কাল্পনিক জগতে। গড়ে নিতে হয় নিজের একটি কাল্পনিক পৃথিবী। কল্পনা করার এই অভ্যাসের ফলে অন্যান্য আর দশজনের চাইতে ভালো কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের উপন্যাস ও গল্পের নানান ঘটনা ও টার্ন, যেকোনো পরিস্থিতিতে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার মতো মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করে দেয়। কোনো একটি গোয়েন্দা কিংবা রহস্য কাহিনী অথবা থ্রিলার কাহিনী একজন ব্যক্তিতে নানান আঙ্গিক থেকে ভাবার ও চিন্তা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাসের ফলে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ব্যস্ত জীবনের নানান কাজের চাপে একসাথে অনেকগুলো কাজ কিংবা মাল্টিটাস্কিং এর মাঝে থাকতে হয়। এই মাল্টিটাস্কিং এর ফলে কোনো একটা কাজের প্রতি ফোকাস করার অভ্যাস কমে যায়। সেই সঙ্গে কমে যায় মনোযোগ ধরে রাখার দক্ষতা। কিন্তু বই পড়ার সময় অন্য কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না। কারণ বই পড়ার সময় একটুও অন্যমনস্ক হলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা হারিয়ে যায়। প্রতিদিন অন্তত ২০ মিনিট বই পড়ার অভ্যাস কাজের প্রতি ফোকাস ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। রাতে ঘুমানোর আগে বই পড়ার ফলে নার্ভ ও মন শান্ত হয়। ফলে খুব অল্প সময়ের মাঝেই ঘুম চলে আসে। অন্যদিকে টিভি দেখা কিংবা মোবাইল ফোন স্ক্রল করার ফলে নার্ভের উপর প্রেশার পড়ে এবং স্ক্রিনের ব্লু-রে ঘুমকে নষ্ট করে দেয়। ফলে রাতের ঘুমের সাইকেলে ব্যাঘাত ঘটে।

জীবন মানেই নানান ধরণের পরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ। সবসময় নিজেকে সকল পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। প্রায়শ ক্লান্তিভাব চলে আসে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে। এমন সময়গুলোতে প্রয়োজন হয় অনুপ্রেরণার। বইয়ের চমৎকার গল্প এক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। কাল্পনিক গল্পগাঁথা কিংবা আত্মজীবনীমূলক বই পড়লে নিজের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়, নিজের ভুলগুলো কিংবা নিজের শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এমনকি জীবনের উদ্দেশ্যকেও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় অনুপ্রাণিত হবার মতো বই পড়ে।

নেদারল্যান্ডের এক গবেষণা থেকে গবেষকেরা দেখেছেন, অন্যান্য সকলের চাইতে বইপড়ুয়ারা কাল্পনিক চরিত্র ও গল্পের মাধ্যমে খুব সহজেই 'ইমোশনালি ট্রান্সপোর্টেড' অর্থাৎ- আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। কোনো একটি বই পড়ার সময় বইয়ের গল্প ও চরিত্রের মাঝে নিজেকে খুব সহজেই মিশিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। নিজেকে তখন চরিত্রগুলো আনন্দ-বেদনার অংশ বলে মনে হতে থাকে। তাদের কষ্টে চোখে পানি জমে, হাসি ফোঁটে তাদের আনন্দে। এর ফলে সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। অন্যের অবস্থা ও অন্যের দুঃখ-কষ্টকে সহজেই অনুধাবন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অবসর সময়ে সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন অনেকেই। কিন্তু সিনেমার চাইতে হাজারগুণ বিনোদনপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর গল্প থাকে একটি বইয়ে। এমনকি অনেক সিনেমা নির্মিত হয় বইয়ের গল্প অবলম্বনে। তবে বইয়ের গল্পের খুব স্বল্প অংশই উঠে আসে পর্দায়। ফলে একটি বই পড়ে যতটা ভালো লাগার অনুভূতি কাজ করে, অনেক সিনেমাতেই তেমনটা হয় না।

তবু আশাহত হলে চলবে না। আমরা তো জানিই-'আশা তার একমাত্র ভেলা'। সেই ভেলায় ভেসে বলতে পারি, কোনো একদিন ঢাকা শহরকেও বই শহর ঘোষণা করবে ইউনেসকো। বই নিয়ে তৎপরতা বাড়বে মানুষের মধ্যে। বই হয়ে উঠবে আমাদের নিত্যসঙ্গী।

বই এমন এক মাধ্যম যার সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বই অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দেয়'। আবার চাণক্য বলেছেন, 'বিদ্যা যাহাদের নাই, তারা "সভামধ্যে ন শোভন্তে"।' আর কে না জানে, বিদ্যা অর্জন করার এক অনবদ্য অনুষঙ্গ হচ্ছে বই। কাজেই বই দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হোক আর না হোক, বইয়ের আবেদন কখনো ফুরাবে বলে মনে হয় না। যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন মানুষের নিঃসঙ্গ প্রহরে বই জ্বেলে দেবে উজ্জ্বল প্রদীপ। কোনো শ্রান্ত দুপুরে, কিংবা বিষণ্ন বিকেলে বই হয়ে উঠবে প্রিয় সঙ্গী। ঘুম ঘুম শীতের রাতে অচিন

কুয়াশার মতো জড়িয়ে ধরবে বই। একটি বই অনেক কিছু মনে করিয়ে দেবে আমাদের। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই নিয়ে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়'। যারা বই পড়েন তারা মূলত এখান থেকে আনন্দ পান। আনন্দ লাভের সাথে জ্ঞান লাভ হয়। নিজেকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। একটি সুশিক্ষিত ও বই পড়ুয়া জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম বাণী 'তুমি পড়ো' এর কথা সর্বজনবিদিত। কুরআন আরও বলেছে, 'যে জানে আর যে জানে না তারা সমান নয়'। আর জানতে হলে বই পড়তে হবে। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনকে ইসলাম ধর্মে অত্যাবশকীয় ঘোষণা করা হয়েছে। সেই অর্থে কোনো মুসলিম নরনারী অশিক্ষিত থাকতে পারেন না।

বই পড়া জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রসারিত করে। বই পড়ার মাধ্যমেই নতুন শব্দভাণ্ডারে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারা যায়। স্মরণশক্তি বাড়াতে দারুন এক কার্যকরী ভূমিকা রাখে বই পড়া। বই পড়ার মাধ্যমে যেকোনো একটা বিষয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অথবা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভালো বই পাঠ চিন্তার উৎকর্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। বই পড়লে শুদ্ধ করে, সুন্দর শব্দ চয়নে লিখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে বই এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। নির্জনতায় এবং বিষন্নতায় নিজের মতো করে শব্দহীন বিনোদন এবং নিজের সুন্দর একটি আবহ তৈরি করতে বই পড়ার বিকল্প নেই। ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ। বহু বিশিষ্ট লেখকও এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই দিনটিতে লেখকদের শ্রদ্ধা জানানো একটি স্বাভাবিক পছন্দ ছিল। এটি এমন একদিন যখন চিত্রকর, লেখক এবং প্রকাশকরা একত্রিত হয়ে উদযাপন করেন। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এটি এমন একটি দিন যা বই পড়া, শেখার এবং ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ উদযাপন করে। বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের করণীয়

স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরে পড়াশুনার মান আমাদের বাড়াতেই হবে সেই সাথে প্রযুক্তির ব্যবহার। পড়াশুনার মান তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি গ্রন্থাগারে গিয়ে বিষয়সংশ্লিষ্ট পুস্তকের অতিরিক্ত রেফারেন্স বই পড়ে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সেই সাথে অন লাইনে শিক্ষক প্রদত্ত ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করে নিজের জ্ঞানস্তরকে সমৃদ্ধ করবে। এ অবস্থায় 'বিশ্ব বই দিবসে' আমাদের পরামর্শ হচ্ছে– ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও গ্রন্থাগারভিত্তিক পড়াশুনায় মনোনিবেশ করানো– শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনার সম্পর্ক দৃঢ়তর করা এবং স্মার্টফোনকে অর্থবহ কাজে লাগানো। প্রতিটি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় যথানিয়মে গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ ছাড়া সরকার নির্দেশিত লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা (ওবিই) বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সর্বস্তরে লক্ষ্যভিত্তিক গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলো সরকার বিবেচনা করতে পারেন–

› শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা। জিডিপি'র ২.৫%-৩.০০% করা যায় কিনা, (চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ব্যয় জিডিপি'র ১.৮৩%)।

› শিশুদের (২-৫) হাতে স্মার্টফোন না দেয়া। এর পরিবর্তে পিতা-মাতাকে শিশুদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া।

› স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ের গ্রন্থাগার পরিচালনা ও এর ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা; প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারে বসে বিভিন্ন বিষয়ের বই পাঠ করা।

› বাড়িতে পড়ার জন্যে তাদের সিলেবাস বহির্ভূত বই ইস্যু করা।

› ঘন ঘন পুস্তক পাঠ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা।

› বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সে সকল গবেষণা কর্মের সাথে সংযুক্ত করা। বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এ যথাস্থানে (উচ্চস্থান) অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে টার্মস অব রেফারেন্সসহ একটি সেল তৈরি করা এবং এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।

› লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম (ওবিই) বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

› লেখক, পাঠক, মুদ্রাকর, ছাপাকর্মী, বইয়ের বিপণনকারী এক কথায় বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ❑

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের সালেহ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল

সংগঠনের কর্মীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ গত **২১ মার্চ বৃহস্পতিবার** এক সালেহ কর্মশালা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করে। ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় "আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ-২) মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের পরিচালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালাটি শুরু হয়। এরপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন দেশের খ্যাতনামা আলেম ও বরেণ্য ইসলামিক স্কলারগণ।

বিকাল ৪টার পর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি), প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, দি ম্যাসেজ ফাউন্ডেশনের চেয়াম্যান শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী, শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য ও ইফতার গ্রহণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শুব্বানের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সদ্য বিদায়ী রামাযানে মাসব্যাপী যে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে, তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যারা কুরআন পড়তে বা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম নন, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দানের উদ্দেশে দেশের ৩৩টি জেলায় ৫০১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এতে শিশু, কিশোর, তরুণসহ নানা বয়সের প্রায় ১০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ কর্মসূচিতে প্রতিদিন সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি সালাতে পঠিত দু'আসমূহ, ছোটো ছোটো সূরা মুখস্থকরণ এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আসমূহের অর্থসহ অনুশীলন করানো হয়।

এছাড়াও ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণের সাথে সম্পর্কিত এবং শির্ক-বিদআত দূরীকরণে প্রতিদিন একটি করে সহীহ হাদীস ও তাওহীদের দারস প্রদান করা হয়।

এ বৃহৎ আয়োজন ফলপ্রসূ করতে ৫০১ জন শিক্ষককে এক মাসের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। শিক্ষকদের সম্মানী, শিক্ষার্থীদেরকে পুস্তক ও সিলেবাস প্রদানসহ এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে যারা সহযোগিতা করছেন তাদেরকে কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ এবং এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান শুব্বানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক এবং শুব্বান রিসার্চ সেন্টারের যুগ্ম-পরিচালক আব্দুল মতিন-সহ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

দোলেশ্বর ও দোলেশ্বর মাদ্‌রাসা শাখা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬ এপ্রিল শুক্রবার বাদ আসর দোলেশ্বর আহলে হাদীস জামে মসজিদে দোলেশ্বর ও মাদ্‌রাসা শুব্বান শাখার কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দোলেশ্বর শাখা শুব্বানের সভাপতি রনি মিয়ার সভাপতিত্বে ও আব্দুর রহমান মোস্তাফিজের উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমদ, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের শুব্বান সভাপতি হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজীব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মী ও সুধীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির আলোচনার পূর্বে দোলেশ্বর মাদ্‌রাসা শাখা কমিটির নাম ঘোষণা করেন তানযীল আহমদ। সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুর রহমান মোস্তাকিজ ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শিফাতুল্লাহ। পরে দোলেশ্বর শাখা কমিটির নাম ঘোষণা করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজীব। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন রানা মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মাশহুরে আলম।

মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ এপ্রিল শুক্রবার বাদ মাগরিব দোলেশ্বর আহলে হাদীস জামে মসজিদে দোলেশ্বর ও মাদ্‌রাসা শুব্বান শাখার উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভা (১ম পর্ব) অনুষ্ঠিত হয়। দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ও দোলেশ্বর আহলে হাদীস জামে মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ গিয়াস উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ও রানা মিয়ার সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমদ, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের শুব্বান সভাপতি হাফেয ওয়াসিম উদ্দিন সজীব, মাদ্‌রাসাতুল হাদীসের ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আল-আমিন মাদানী, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র এবং দোলেশ্বর এলাকা জমঈয়ত, শুব্বান কর্মী ও সুধীবৃন্দ।

যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত ও ‘আমল

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ". يَعْنِيْ أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ "وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ".

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর নিকট যে কোনো দিনের সৎ ‘আমলের চাইতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ‘আমল অধিক প্রিয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেন : না, মহান আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং এর কোনো একটি নিয়েও ফিরে না আসে তার কথা স্বতন্ত্র। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৩৮, সহীহ)*

যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিষয়

১. খাঁটি মনে তাওবাহ্ করা।
২. হজ্জ ও ‘উমরাহ্ আদায় করা (সামর্থবান হলে)।
৩. নিয়মিত ফর্‌য ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া।
৪. বেশি করে নেক ‘আমল করা।
৫. আল্লাহ তা‘আলার যিক্‌র করা।
৬. বেশি বেশি ও উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা–
اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.
৭. ০৯ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন করা বিশেষতঃ আরাফার দিবসে।
৮. ১০ তারিখে ঈদের সালাত আদায় করা।
৯. কুরবানি করা (সামর্থবান হলে)।
১০. বেশি বেশি দান করা।
১১. সর্ব প্রকার পাপ হতে বিরত থাকা।
১২. কুরবানী সম্পন্ন না করা পর্যন্ত চুল, নখ না কাটা।
১৩. ঈদ উপলক্ষে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কাজ বা আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

হাজ্জযাত্রীর স্বাস্থ্যকথা

–প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

সৌদী আরবের সীমানা ও আবহাওয়া : উত্তরে জর্ডান ও ইরাক; পূর্বে কুয়েত, কাতার, আমিরাত; দক্ষিণে ওমান ও ইয়েমেন; পশ্চিমে লোহিত সাগর। উত্তর দিকে জর্ডানের উত্তরে হচ্ছে জেরুজালেম ও সিরিয়া। পূর্ব দিকে কুয়েত, কাতার ও আমিরাতের পূর্বে হলো পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর। দক্ষিণ দিকে ওমান ও ইয়েমেনের দক্ষিণে অবস্থিত আরব সাগর। লোহিত সাগরের পশ্চিমে আছে মিশর। পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরটি উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে আরব সাগরের মাঝে অবস্থিত।

সৌদী আরবের আয়তন হলো ২৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৯ লক্ষ বর্গ মাইল)। আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে সতের গুণ বড়। দেশটি মরুময় বৃক্ষহীন মালভূমি। এর পশ্চিম দিকটা উঁচু ও পাহাড়-পর্বত এবং পূর্ব দিকটা নিচু। জেদ্দা, মক্কাহ্, মাদীনাহ্, এলাকাগুলো পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিধায় পাহাড়িয়া ও পর্বতময় এলাকা। কা'বা থেকে মীনার দূরত্ব প্রায় ৭-৮ মাইল। আবার মীনা থেকে আরাফাতের দূরত্ব ঠিক অনুরূপ। বায়তুল্লাহ ও আরাফাতের মাঝামাঝিতে অবস্থিত হলো মীনা। মুযদালিফা হচ্ছে মীনা ও আরাফাতর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত যার দূরত্ব উভয় স্থান থেকে ৩-৪ মাইল। জেদ্দা থেকে মক্কার দূরত্ব ৪৫ মাইল। অপরদিকে মক্কাহ্ থেকে মাদীনার দূরত্ব হলো প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে।

সৌদী আরব তিন দিক দিয়ে সমুদ্র বেষ্টিত থাকলেও সবচেয়ে শুকনো দেশ। আবহাওয়া চরম শুকনো মেঘবিহীন আকাশ থাকার কারণে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪৫-৫০ সেলসিয়াস হয়। বাংলাদেশে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩৫ সেলসিয়াস। সৌদী আরবে গ্রীষ্মকালে রাতের তাপমাত্রা ১১-২২ সেলসিয়াস হয়। ঐ দেশের গ্রীষ্মকালটি লম্বা এবং এ সময়ে বৃষ্টিপাত ঘটে না। অপরদিকে শীতকালটি ছোট এবং সামান্য বৃষ্টি হয়। সৌদী আরবে বাতাসের আর্দ্রতা মে মাসে ০% এবং তখন বাংলাদেশে ৭০%-৯০%। বাংলাদেশের বাতাসে এই আর্দ্রতা থাকার কারণে আমাদের দেহে ঘাম দিলে গা ভিজে থাকে। সৌদীতে যেহেতু বাতাসের আর্দ্রতা নেই, ফলে বাতাস একেবারেই শুকনো। খানিকটা হাটার পর শরীরের ঘাম সাথে সাথে বাতাসে শুকিয়ে যায়।

ঐ দেশে একটু ঘেমে গেলেই দুর্বল অনুভব হয়। কারণ ইতিমধ্যে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেড়িয়ে বাতাসে শুকিয়ে গেছে ফলে দেহ থেকে প্রয়োজনীয় পানি, খনিজ ও লবণ জাতীয় পদার্থ বেড়িয়ে যাওয়াতে শরীরটা দুর্বল হয়ে যায়। ছাতা ও পানির বোতল ছাড়া রাস্তায় চলা ফেরা করা অনুচিত। সৌদী আরব দেশটিতে আমাদের বাংলাদেশের মত নদ-নদী নালা-খাল-বিল-হ্রদ ইত্যাদি নেই। শুধু পাথর বালি ও পাহাড়-পর্বত অধ্যুসিত গাছ-পালা জঙ্গল বিহীন দেশ।

হাজ্জ মৌসুমে যে সমস্ত রোগ হতে পারে

তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশি হাজীগণই বেশি অসুস্থ হন। কারণ, বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ বয়স্করা হাজ্জ পালন করতে যান। সেজন্যে বার্দ্ধক্যজনিত কারণে এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বয়স্করা তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উত্তাপজনিত ব্যাধি, পেটের পীড়া, সর্দ্দি কাশি, শরীর ব্যাথা ও ম্যাজ ম্যাজ করা, গলা বসে যাওয়া ইত্যাদি –এগুলো হলো লঘুতর উত্তাপ জনিত ব্যাধি ঐ সময় হতে পারে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক উত্তাপজনিত ব্যাধিসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা :

* লঘুতর উত্তাপজনিত পীড়া (Minor heat disorders)।
* গুরুতর উত্তাপজনিতপীড়া (Major heat disorders)।

উপরে বর্ণিত দৈহিক সমস্যাগুলো সাধারণত বেশি দেখা দেয়।

লঘুতর উত্তাপজনিত পীড়াসমূহ– প্রখর উত্তাপ পরিবেশে অবস্থানের সময় অল্পক্ষণের মধ্যে যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির উত্তাপজনিত ক্লান্তি রোগ দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পরিবেশে ফিরে এলে আরোগ্য হয়ে যায়। প্রতিরোধক হিসেবে অযথা রৌদ্রে ঘোরা ফেরা না করা। দিনের বেলা বাইরে সর্বদা ছাতা ব্যবহার করা, আর ঢিলা ও সাদা পোশাক পরিধান করা। অসুস্থতা দেখা দিলে ঠাণ্ডা ঘরে অবস্থান করা।

* সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

গুরুতর উত্তাপজনিত পীড়াসমূহ– উপসর্গ, দুর্বলতা, অস্থিরতা, বমি বমি ভাব, চোখে ঝাপসা দেখা, নাড়ির গতি দুর্বল হয়ে কমে যাওয়া, শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা ও আর্দ্র হওয়া, রক্তের চাপ কমে যাওয়া।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ : লবণ পানি পান করা অথবা খাবারের স্যালাইন (ORS) যা হাজ্জ মেডিক্যাল মিশনে পাওয়া যায়, তা পান করা। মারাত্মক রোগীর বেলায় আন্তঃশিরায় স্যালাইন (Intra-venous saline) দিলে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে।

প্রচুর ঘাম নির্গত হওয়ার দরুন যে পানি পিপাসা হয় তা নিবারণ করার জন্যে লবণ বিহীন পানি পান করলে উক্ত রোগটি দেখা দেয়। সে জন্য লবন মিশ্রিত পানি পান করা ভালো।

হীট স্ট্রোক : উত্তাপজনিত সংজ্ঞা লোপ (Heat stroke) সম্বন্ধে ওল্ড টেস্টামেণ্টে বর্ণিত আছে যে, হীট স্ট্রোক রোগটি উত্তপ্ত মাঠে শারীরিক কসরতর ফলে হয়ে থাকে। রোগটি মক্কায় হাজ্জযাত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় যদি হাজ্জব্রত প্রখর গরমের মৌসুমে অর্থাৎ- মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। **কারণ,**

- শরীরে উচ্চ তাপমাত্র থাকলে।
- শারীরিক কসরৎ করলে, অতি পরিশ্রান্ত।
- শরীরের জলীয় ভাগ হ্রাস হলে।
- হাজ্জযাত্রীর পূর্ব থেকে হৃদরোগ, বহুমুত্র রোগ ও অনিদ্রা থাকলে।
- হাজ্জযাত্রী যদি অপুষ্টিতে ভুগেন।
- বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, শিশু।

হীট স্ট্রোকে শরীরের ক্ষতিগুলো শরীরের কোষসমূহ ফুলে ফেঁপে যায়। আণুবীক্ষণিক থেকে বৃহদাকার পর্যন্ত রক্তক্ষরণ হয়ে অঙ্গসমূহ ফুলে যায়। মস্তিষ্কে ফোলা দেখা দেয়। হৃদপিণ্ডে রক্তক্ষরণ হয় এবং মাংসের আঁশসমূহে পচন ধরে। কিডনীতে রক্তক্ষরণ হয়ে পীড়িত হতে পারে। যকৃতে (Liver) পচন ধরে। অগ্ন্যাশয়ে (Pancreas) রক্তক্ষরণ হয়।

উপসর্গ :

- হীট স্ট্রোক রোগটি আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়।
- প্রথমতঃ দুর্বলতা ও অসংলগ্ন আচরণ, পরে রোগী অচেতন হয়। ক্ষণিক মুর্ছা যাওয়া থেকে গভীর অচেতন পর্যন্ত হয়। খিঁচুনিও হতে পারে।
- রক্তচাপ কমে যায়।
- শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।
- চক্ষুদ্বয় দৃঢ় হয়ে যাওয়া। চক্ষুর তারা (Pupil) সংকোচন হওয়া। চোখের কর্ণিয়ার (Cornea) প্রতিক্রিয়া (Reflex) নষ্ট হয়।
- পেশীবন্ধসমূহের (Tendons) প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।
- ঠোঁট ও মুখ নীলবর্ণ ধারণ করা।
- পানির মতো পাতলা পায়খানা অথবা রক্তাক্ত পায়খানা হওয়া। রক্তাক্ত বমি হওয়া।
- তীব্রতা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট হয়ে উপরে বর্ণিত উপসর্গ প্রকাশিত না হয়ে রোগী মৃত্যুবরণ করতে পারে।

চিকিৎসা : রোগীকে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত অথবা হাজ্জ মেডিক্যাল মিশনের চিকিৎসকের গোচরীভূত করা কর্তব্য। সৌদী সরকার জনাকীর্ণ এলাকায় হীটস্ট্রোক হাসপাতাল নির্মাণ করে রোগীদের উপযুক্ত ও সর্বাধুনিক সুচিকৎসার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

প্রতিরোধ :

- প্রখর রৌদ্র ও গরমে অযথা বাইরে চলাফেরা না করা।
- দিনের বেলায় কোথাও চলাফেরার প্রয়োজন হলে পানির বোতল সঙ্গে রাখা এবং চলন্ত অবস্থায় বেশি করে এবং ঘন ঘন পানি পান করা। ছাতা ব্যবহার করা। সাদা ও ঢিলা পোষাক পরিধান করা।
- ঠাণ্ডা ঘরে (Air conditioned) অবস্থান করা।
- জ্বর অথবা যে কোনো অসুখ দেখা দিলে সাথে সাথে হাজ্জ মেডিক্যাল মিশনের চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- অতিরিক্ত মোটা লোক, অথবা যারা পূর্ব থেকেই হৃদরোগ বা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত তারা সর্বক্ষণ সাবধানতা অবলম্বন করে চলবেন এবং হাজ্জ মেডিক্যাল মিশনের চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।
- হীট স্ট্রোক রোগ সন্দেহ হলে তাড়াতাড়ি রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

অন্যান্য ব্যাধিসমূহ–

- গ্যাস্ট্রো এনটারাইটিস বা পেটের পীড়া।
- উচ্চতর শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রে প্রদাহ।
- ভাইরাল জ্বর।
- দুর্ঘটনাজনিত বিভিন্ন ব্যাধি।
- মানসিক সমস্যা।

পেটের পীড়া (Gastro enteritis) : অপরিষ্কার পানীয় ও খাদ্য ভক্ষণ করলে উল্লিখিত রোগটি দেখা দিতে পারে। লক্ষণগুলো হচ্ছে– পানির মতো দাস্ত, বমি, তৎসঙ্গে জ্বরও থাকতে পারে। অতিরিক্ত দাস্ত ও বমি হয়ে রোগী মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে পারে। সময় মতো অর্থাৎ- রোগের লক্ষণ দেখা মাত্রই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে রোগী তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ :

- খাবারের পুর্বেই হাত ভালো করে ধুয়ে নেয়া।
- ভক্ষণের পূর্বে ফলগুলো ভালো করে ধুয়ে নেয়া।
- ঢাকনা বিহীন খাবার না খাওয়া।
- নিম্নমানের এবং যে খাদ্যে মাছি বসেছে সেগুলো না খাওয়া।

রোগ দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন। খাবারের সেলাইন বাংলাদেশ হাজ্জ মেডিক্যাল মিশনে পাওয়া যায় সেখান থেকে পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করে রাখা এবং রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়া মাত্রই তা ঘন ঘন খাওয়া উচিত। দাস্ত নিরোধ বড়ি অথবা এন্টিবায়োটিকস চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে খাবেন। মারাত্মক রোগীর বেলায় আন্তঃশিরায় স্যালাইন তৎসঙ্গে সাড়ে সাত পার্সেন্ট সোডিবাইকার্ব ইনজেকশন ঐ স্যালাইনে মিশ্রণ করে দেওয়া হয় যদি বমি হতে থাকে।

উচ্চতর শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র প্রদাহ (URTI) : প্রচুর ভিড়ের মধ্যে চলাফেরা করলে এবং এক কামরায় অনেক লোক বসবাস করলে এই রোগ হতে পারে। এতে কাশি, জ্বর, বুকব্যাথা, গলাব্যাথা, সর্দি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় অত্যাধিক ভিড় হয়ে থাকে। তাই যতটুকি সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলা এবং এক কামরায় অনেক লোক বসবাস না করা। ধুমপান না করা।

ভাইরাস জ্বর : এই জ্বর সাধারণত এক প্রকার ভাইরাস (Virus) জাতীয় রোগজীবানুর জন্যে হয়ে থাকে। এতে জ্বর, শরীরব্যাথা, মাথাব্যাথা, হাতপাগুলো কামড়ানো বা ব্যাথা করা, সর্দি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এর কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই তবে শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে অনেকটাই উপকার হয়। প্যারাসিটামল বড়ি দিনে ৩ বার আহারের পর খাবেন।

দুর্ঘটানাজনিত বিভিন্ন ব্যাধি : কোনো দুর্ঘটনা বা একসিডেন্টের ফলে বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যাধি দেখা দিতে পারে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়, জামারায় ঢিল মারার সময় এবং শুক্রবার জুম্মা সলাতের পর পরই হারাম শরীফ থেকে বেরুবার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রচণ্ড ভিড়ের শিকার হন আমাদের গ্রামের সাধারণ ও নিরীহ বয়স্ক ও নারী হাজীগণ এবং তাতে বিভিন্ন উপসর্গসহ বুকে ব্যাথা হয়ে থাকে। এই সমস্ত কাজ হিকমত খাটিয়ে ধীরস্থিরে ভিড় এড়িয়ে সমাধান করলে দুর্ঘটনাজনিত বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যাধি এড়ানো সম্ভব।

হাজ্জযাত্রীদের যে সমস্ত মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে

কেউ বহু বছর নিজ পরিবেশে থেকে অন্য অপরিচিত পরিবেশে গেলে তার মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিদেশে নতুন পরিবেশে ভাষা, খাবার দাবার, চলাফেরা, আচরণ সবগুলোই ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্য অনিদ্রা, বিষন্নতাবোধ, অবষাদগ্রস্ত এমনকি সন্দেহ বাতিকতাও দেখা দিতে পারে। কেউ ক্ষতি করছে এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাতে পারে (Paranoid)। বর্ণিত সমস্যাগুলোকে এক কথাই স্বল্পকালীন দেশান্তরজনিত মানসিক বিপর্যস্ততা বা কালচার শক (Culture shock) বলা যায়। এগুলো মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের সমস্যা হিসেবে প্রকাশ পায়। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে রোগী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য দুঃশ্চিন্তা (Seperation anxiety), প্রিয়জন হারানোর মতো শোকাচ্ছন্নতা (Bereavement), বিষণ্নতাবোধ (Depression), এডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডারস দেখা দিতে পারে।

পূর্ব থেকেই বই পুস্তক পড়ে সৌদী আরবের পরিবেশ, ভৌগলিক অবস্থান, মানুষের আচার-আচরণ এবং হাজ্জের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি জেনে নিবেন। পূর্বে যারা হাজ্জ করেছেন তাদের কাছে থেকেও সার্বিক অবস্থা ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন। বয়স এবং স্থান-কাল-পাত্র কোনো ব্যাপার নয় মনোবলটাই আসল। মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকবেন। দেহকে রিলাক্স এবং মনকে কনসেনট্রেট করে রাখবেন তাহলে মানসিক শক্তি বাড়বে ইন্‌শা-আল্লাহ।

হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ

আরাফাত ডেস্ক :

১. হাজ্জযাত্রীগণ একটি চামড়ার অথবা ক্যানভাসের কিংবা রেকসিনের স্যুটকেস ও একটি হাতব্যাগ নিবেন। কাপড়-চোপড়, জুতা, থালা-বাসন, গ্লাস প্রভৃতি যা হাজ্জযাত্রীদের প্রয়োজন হবে তা ঐ দেশ থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এখান থেকেও ঐগুলো সাথে নেয়া যায়। একটি বেল্ট আট শাট করে কোমরে ইহ্রামের পরনের লুঙ্গির উপর দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত। যাতে ইহ্রামের কাপড় খুলে না যায়।

২. গলায় ঝুলানো কাপড়ের ছোট এক খানা ব্যাগ রাখা উচিত, যাতে মোবাইল, রিয়াল, ডলার, পাসপোর্ট, টিকিট, মোয়াল্লেমের (মুতাওয়াফ) ও হোটেলের নাম ঠিকানা প্রভৃতি রাখা যায়।

৩. সুটকেস, ব্যাগ বা লাগেজের উপর নিজের নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর, ফোন নম্বর, মোয়াল্লেমের নাম ইংরেজিতে লিখে রাখবেন। তিনটি জিনিসের হিফাযত করা রিয়াল বা ডলার, মোবাইল ও পাসপোর্ট। বিদেশে এগুলোই হচ্ছে সম্বল। কা'বাহ্ঘর তওয়াফের সময় এবং মিনাতে জামারাতে ঢিল মারার সময় প্রচণ্ড ভিড় হয়। এই প্রচণ্ড ভিড়গুলোর মধ্যে টাকা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

৪. সৌদী আরবে অবস্থানকালে প্রচুর যম্যম্ের পানি পান করবেন। কমলা, আঙ্গুর, মাল্টা, আপেল, সেফ, জায়তুন, খেজুর প্রভৃতি ফল বেশি পরিমাণে খাবেন। সবসময় দলবদ্ধভাবে হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতা, চলাফেরা ও থাকা-খাওয়া করবেন।

৫. মিনার তাবুর ঠিকানা লিখে নেবেন। হাজ্জ এজেন্সির কর্তৃপক্ষের মোবাইল নম্বরগুলো সাথে রাখবেন। মোবাইল সব সময় সাথে রাখবেন। মক্কার হোটেলের ঠিকানা (কার্ড) সাথে রাখবেন। মিনায় হারিয়ে গেলে মক্কার হোটেলে চলে আসবেন। তারপর সাথীদের সাথে যোগাযোগ করবেন।

৭. ময়লা কাপড় চোপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ (হাদীস)। কোনো কিছু খেতে হলে হাত ধুয়ে নিবেন। বাইরে চলাফেরার সময় সর্বদা পানির বোতল ও ছাতা ব্যবহার করবেন।

৮. কোনো সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করতে পারলে দলনেতা দ্বারা বাংলাদেশ হাজ্জ মিশনের সাথে যোগাযোগ করবেন। মিশনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বদা উড্ডয়ন অবস্থায় থাকে।

৯. চিকিৎসা ও ঔষুধ পত্রের প্রয়োজন হলে মেডিকেল মিশনে উপস্থিত হবেন। পথ ভুলে গেলে বা হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়নের স্থানে হাজ্জ ও মেডিকেল মিশনে এসে অবগত করালে সাহায্য পাওয়া যাবে।

১০. পাসপোর্ট, টিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র সযত্নে রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট কি-না তা দেখে নেবেন, কারণ পাসপোর্ট বদল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১১. নিজেরা বহন করতে পারবেন এমন মালপত্র সঙ্গে রাখবেন। সেখানে কোনো কুলি মজুর নেই। সুই, সূতা, ছুরি, কাচি লাগেজে নেবেন, হ্যান্ড ব্যাগে রাখবেন না।

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ গান প্রথমে ও শেষে। মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আর যারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন তাদের প্রতি –আমীন।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আট রাকআত তারাবীহ প্রমাণিত। রাকআত সংখ্যা বাড়িয়ে এবং কিরআত লম্বা না করে সালাত দীর্ঘ করার নিয়তে আট রাকআতের বেশি আদায় করা যাবে কি?***

আব্দুল বশির
দাউদকান্দি।

জবাব : নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সুন্নাত ও 'আমল দ্বারা তারাবীর সালাতে রাকআত সংখ্যা প্রমাণিত। তা হচ্ছে বিতরসহ এগারো বা তেরো রাকআত– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৬৯)***। এই রাকআত সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কওলী হাদীস দ্বারা রাতের সালাত এর রাকআত সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি। শুধু দুই দুই রাকআত পড়ার কথা বলা হয়েছে এবং রাত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাকআত বিতর আদায় করে রাতের সালাতে সমাপ্তি করার তাগিদ এসেছে– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৯)***। সালাফদের থেকে আট রাকআতের বেশি পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই হিসেবে আপনার জন্য কিরআত লম্বা করে কিংবা খাটো করে, যেভাবে ইচ্ছা আট রাকআতের বেশি পড়তে পারেন। তবে সুন্নাত পালন করাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***কেউ যদি বিশ রাকআত তারাবীহ আদায় করে এই বিশ্বাসে যে, এটা রাসূলের সুন্নাহ অথবা এই বিশ্বাসে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ রাকআত পড়েছেন, তাহলে তা কি বিদআত হবে?***

এনায়েত হোসেন
উঠালি, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব : উপরোক্ত নিয়তে ও বিশ্বাসে বিশ রাকআত তারাবীর সালাত পড়া মারাত্মক ভুল হবে। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আটের বেশি পড়া সহীহ মারফু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং কেউ যদি দাবি করে যে, বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াই সুন্নাত এবং এই সংখ্যাটা সহীহ দ্বারা প্রমাণিত, তাহলে সে এ বিষয়ে বিদআতী 'আক্বীদাহ্ পোষণকারী বলে গণ্য হবে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***বাংলাদেশে কি খিলাফত কায়েম করা সম্ভব?***

আবু সাঈদ, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও মক্কাতে তাই করেছেন। তিনি ১৩ বছর মক্কাতে তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তিনি মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে তিনি তাওহীদ ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। সুতরাং আমরাও তাই করবো। প্রথমে আমরা তাওহীদের দা'ওয়াত দিবো। অতঃপর আমরা আমাদের সমাজে ইসলামী শাসন কায়েম করবো। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদ বুঝে না। এমনকি তারা ইসলামের পবিত্র বাক্য "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"র অর্থও বুঝে না; বরং অধিকাংশই এর উল্টা ব্যাখ্যা করে থাকে। তাই তাওহীদ না বুঝে এবং এর মর্মার্থ ও দাবি না বুঝে খিলাফত কায়েম করার বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার আন্দোলন করা নবী-রাসূলদের দা'ওয়াতের পরিপন্থি। তাই আমরা আপনার প্রশ্নের জবাবে বলবো– বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর অন্য যে কোনো স্থানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব। তবে তাওহীদ বাস্তবায়ন করার আগে অথবা তাওহীদের দা'ওয়াত না দিয়ে প্রথমেই খেলাফত কায়েমের দা'ওয়াত দেয়াটা হিকমত, বুদ্ধিমত্তা ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থি কাজ বলে গণ্য হবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***ইবনে সিনা, ফারাবি, আল কিন্দি এদের 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।***

মো. রোকনুজ্জামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : ইবনে সীনাকে সবচেয়ে বড় মুসলিম দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি দর্শন, মানতেক এবং মেডিক্যাল সাইন্স এর উপর অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত শিফা ও কানুন নামক দু'টি গ্রন্থ ডাক্তারী বিদ্যায় রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু তার

'আক্বীদায় সমস্যা রয়েছে। তার থেকে অনেক কুফ্‌রী কথা বর্ণিত থাকার কারণে আলেমগণ তাকে কাফির বলেছেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাওবাহ্ করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। মহান আল্লাহই জানেন তিনি কোন্ 'আক্বীদার উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনে সীনা তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আল-উবাইদী'র দা'ওয়াতে বিশ্বাসী। জ্ঞানীদের সবাই এ কথা জানে যে, আল হাকিম বি আমরিল্লাহ আল-উবাইদী হিজরি চতুর্থ শতকে মিশর শাসন করেছে। সে কারামেতা বাতেনী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা ইসলামের কোনো মূলনীতিতেই বিশ্বাস করতো না, পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত কোনো রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস করতো না– ***(দেখুন : ইগাসাতুল লাহফান- ২/১০৩১)***। শুধু তাই নয়. তিনি তাকে নাস্তিকদের লিডার বলেছেন– ***(দেখুন : আস্ সাওয়ায়েকুল মুরসালা- ৩/১১০৫)***।

ইবনে সীনার সমসাময়িক আলেমগণ ইবনে সীনা ও ফারাবীর কুফ্‌রী 'আক্বীদার কারণে তাদেরকে কাফির বলেছেন– ***(দেখুন : লিসানুল মীযান- ২/২৯৩)***। ইমাম গাযালীও তাকে কাফির বলেছেন– ***(দেখুন : আল-মুনকিযু মিনায যালাল- পৃ. ১৪৪)***।

বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শেষ জীবনে মৃত্যুর সময় তাওবাহ্ করেছেন। তবে কথাটি প্রমাণিত নয়। মোটকথা, তার কুফ্‌রী, নাস্তিকতা, বিদআত ও গোমরাহী থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আর তার তাওবার ব্যাপারে আমরা আশা করি যে, তিনি তা করেছেন। ***(বিস্তারিত দেখুন : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১৫/৬৬৮)***

জিজ্ঞাসা (০৫) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিতি অথবা কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ যে জরিমানা নেওয়া হয় তা কি শরিয়তসম্মত? দলিলভিত্তিক বিস্তারিত জবাব দিবেন ইন্‌শা-আল্লাহ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সদর ঠাকুরগাঁও।

জবাব : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং ছাত্রদের উপকারের জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করা এবং ছাত্রদেরকে তা মানতে বাধ্য করা দোষনীয় নয়। যেমন- আর্থিক জরিমানা নির্ধারণ করা কিংবা ছাত্রের ভর্তি করা বা অন্য কোনো নীতিমালা তৈরি করা। তবে এমন কিছু করা যাবে না, যা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী এবং যা যুলুমের পর্যায়ে চলে যায়।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমাদের একটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম Barakah™। এখন শুনছি নাকি এই নামকরণ কোনো কোম্পানির জন্য জায়িয নেই। এটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। সঠিক পরামর্শ কামনা করছি।

রাবেয়া খাতুন, নাজির বাজার, ঢাকা।

জবাব : বারাকা কিংবা বরকত শব্দটি আরবী এর অর্থ হচ্ছে কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং তা স্থায়ী হওয়া। বরকত আল্লাহ দান করেন, স্থায়ী করেন ও বৃদ্ধি করেন। তবে কোনো জিনিষের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন, তা ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু সৃষ্টির মধ্যে বরকত দিয়েছেন। যেমন- তিনি মক্কা, মদীনা ও ফিলিস্তীনের যমীনকে বরকতময় করেছেন। বেশ কিছু খাবার ও পানীয় যেমন- যাইতুন, খেজুর, কালো জিরা, দুধ, মধু ও যম্‌যমের পানির মধ্যে বরকত দিয়েছেন। অনুরূপ বেশ কিছু সময়কেও তিনি বরকতময় করেছেন। এগুলোতে বরকত থাকা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত। সেই হিসেবে আপনাদের সংগঠনকে বারাকাহ বলে নাম করা ঠিক হবে না। আশা করি অন্য একটু সুন্দর নাম বাছাই করবেন।

জিজ্ঞাসা (০৭) : শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, কাঁকড়া ও অক্টোপাস খাওয়া কি হালাল না-কি হারাম? জানালে উপকৃত হবো।

আতাউর রহমান, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জবাব : পানিতে যেসব প্রাণী বসবাস করে, তার সবই হালাল। তবে যেগুলো শুধু পানিতেই থাকে। সেগুলোর নাম মাছ হোক অথবা অন্য কিছু হোক। আর যেগুলো উভয়চর, তার সবগুলো হালাল নয়। জলজ প্রাণী জীবিত পাওয়া কিংবা মৃত অবস্থায় পানিতে ভাসমান পাওয়া যাক, তা খাওয়া হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾

"তোমাদের জন্য সাগরের শিকার ও খাবার হালাল"– *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯৬)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

"সাগরের পানি পবিত্র এবং সাগরের মৃত প্রাণী হালাল"– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৩, সহীহ)*। স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন, যেগুলো শুধু পানিতেই থাকে, সেগুলোর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তা খাওয়া হালাল– ***(দেখুন : ফাতাওয়া নং- ২২/৩১৩)***।

তবে যেগুলো নোংরা অথবা ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত যেগুলো খাওয়া বৈধ নয়। ঝিনুক নোংরা ও অরুচিকরের মধ্যে পড়তে পারে। কচ্ছপ, অক্টোপাস ও কাঁকড়া

অরুচিকর নয় বলেই মনে হয়। সুতরাং তা খাওয়া হালাল। সুতরাং এগুলো কারো কাছে রুচিকর হলে খেতে পারে। রুচি না হলে অন্যগুলো খাবে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : সম্মিলিত মুনাজাত করা ব্যক্তিকে কি বিদআতী বলা যাবে? কুরআন হাদীসের আলোকে জানতে চাই?

আলহাজ্জ আ. হালিম মণ্ডল, গাইবান্ধা।

জবাব : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর, জুমু'আর সালাতের পর, ঈদের সালাতের পর, ওয়াজ মাহফিল শেষ করার পর এবং অন্যান্য উপলক্ষে সম্মিলিত মুনাজাত করা নবী (ﷺ)-এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এটা এমন বিদআত নয়, যা কুফ্‌রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ বিষয়ে সর্বাধিক সুন্দর কথা হচ্ছে দু'আ সালাতের ভিতরেই করা উচিত। নবী (ﷺ)-এর সালাতের শেষ বৈঠকে এবং সিজদায় দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন। সালামের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার আদেশ দেননি। আর এ বিষয়ে জমঈয়তের মুখপাত্র সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীসে একাধিক ফাতাওয়া দেয়া হয়েছে। পাঠক মহোদয়কে পূর্বের সংখ্যাগুলোতে নযর দেয়ার আহ্বান করা হলো।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি কিছু ফসল উৎপাদন করি। যেমন- শসা, করলা, বরবটি, মরিচ। এগুলোর উশর কিভাবে দিতে হবে?

দাউদ খান সাকু, নোয়াখালী।

জবাব : এগুলোর কোনো যাকাত নেই। তবে নফল সাদাক্বাহ্, দান ও হাদীয়া হিসেবে এগুলো থেকে কিছু দান করলে অবশ্যই সাওয়াব পাবেন।

জিজ্ঞাসা (১০) : যারা আল্লাহর নবী (ﷺ)-কে হাবীবুল্লাহ (মহান আল্লাহর হাবীব) বলে তাদের হুকুম কি?

লিটন আহমেদ
মালদা, কলকাতা।

জবাব : নবী (ﷺ) মহান আল্লাহর বন্ধু। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহকে তিনি খুব ভালোবাসতেন মহান আল্লাহও তাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। তা হলো খালীলুল্লাহ বা মহান আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। সুতরাং রাসূল (ﷺ) মহান আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেন,

«إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا».

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন"– ***(সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : মুকাদ্দামাহ, হা. ১৪১, মাওযূ')***। যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে হাবীবুল্লাহ গুণে গুণান্বিত করল, সে নবী (ﷺ)-এর মর্যাদা কমিয়ে দিলো। হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর মর্যাদা বেশি। প্রতিটি মু'মিনই মহান আল্লাহর হাবীব। কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর মর্যাদা এর চেয়ে বেশি। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে খলীল বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই জন্যই আমরা বলি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) খলীলুল্লাহ। কারণ হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর ভিতরে বন্ধুত্বের অর্থ বেশি পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১১) : জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– মহিলাদের জন্য কি আছে?

মুনজেরিন
সংকর, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জবাব : জান্নাতীদের নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ﴾

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করো"– ***(সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৩১)***। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾

"এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" ***(সূরা আয্ যুখরুফ : ৭১)***

এটা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁকে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِيْ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"– ***(সূরা গা-ফির : ৮)***। আর দুনিয়াতে যদি অবিবাহিত থাকে তাহলে জান্নাতে তার নয়ণ জুড়ানো কোনো পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা –কথাটি কি ঠিক? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কি?***

আফসানা আক্তার
মানিকনগর, ঢাকা।

জবাব : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা –কথাটি ঠিক। কেননা নবী (ﷺ) একদা খুৎবাহ্ প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرَ».

“হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে সাদাক্বাহ্ করো। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে –এই প্রশ্ন নবী (ﷺ)-কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে মানুষের উপরে অভিশাপ করে থাকো এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার করো”– ***(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুল হায়য, হা. ৩০৪)***। নবী (ﷺ) এই হাদীসে নারীদের বেশি হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশি পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***মহিলাদের নিকাব ও হাতমোজা পরিধান করে নামায পড়তে হবে? না হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখবে?***

ইসরাত পারভিন
জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : মহিলারা যদি নিজ গৃহে অথবা এমন স্থানে নামায আদায় করে, যেখানে মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে দেখে না তাহলে তার জন্য শরীয়তসম্মত হচ্ছে, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় খোলা রাখা। যাতে করে সিজদার সময় কপাল এবং উভয় হাত মাটিতে লাগাতে পারে।

কিন্তু তারা যদি এমন স্থানে নামায পড়ে যার আশ-পাশে পরপুরুষ রয়েছে, তাহলে অবশ্যই মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে। কেননা গাইরে মাহরামের (যার সাথে বিবাহ জায়িয) সামনে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাদের সামনে মুখ খোলা জায়িয নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত এবং বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির দলিল দ্বারা এটি প্রমাণিত। যা কোনো মু'মিন-মুসলিম এমনকি সাধারণ বিবেকবানও বর্জন করতে পারে না।

মহিলাদের হাতমোজা পরিধান করা শরীয়তসম্মত। মহিলা সাহাবীদের 'আমল দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে। নবী (ﷺ) নারীদের ইহরাম বাঁধার নিয়মের মধ্যে উল্লেখ করেছেন,

«وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».

“মুহরিম মহিলা নিকাব পরবে না এবং হাতমোজাও পরিধান করবে না–” ***(সহীহুর বুখারী- ইহরাম অবস্থায় শিকার করার জরিমানা, হা. ১৮৩৮)***। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল হাতমোজা পরিধান করা। অতএব পরপুরুষের উপস্থিতিতে নামায পড়ার সময় মহিলাদের হাতমোজা পরিধান করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নামাযের সময় তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার ব্যাপারে কথা হলো, তারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় তা ঢেকে রাখবে। সিজদায় যাওয়ার সময় মুখমণ্ডল খুলবে। যাতে কপাল সিজদার স্থানে বা যমিনে লেগে যায়।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***যে ব্যক্তি নামায শেষ করার পর জানতে পারলো যে, সে এমন অপবিত্র অবস্থায় ছিল, যাতে গোসল আবশ্যক তার করণীয় কী?***

মুস্তাকিম আহমেদ
বজরা বাজার, নোয়াখালী।

জবাব : যে লোক নামায আদায় করার পর জানতে পারবে যে, তার সাথে বড় নাপাকী বা ছোট নাপাকী ছিল তার উপর ওয়াজিব হলো, সে অযূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করা। কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন,

«لَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ».

“পবিত্রতা ব্যতীত কারো নামায কবূল করা হবে না।” ***(সহীহ মুসলিম- কিতাবুত্ তাহারাহ, হা. .../২২৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫৯, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***সিজদার কারণে কপালে দাগ পড়া কি সৎলোক হওয়ার আলামত?***

হেলাল উদ্দিন
জয়পুরহাট।

জবাব : সিজদার কারণে কপালে দাগ পড়া সৎলোক হওয়ার আলামত নয়; বরং চেহারার নূর, অন্তরের প্রশস্ততা, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি হলো সৎলোক হওয়ার আলামত। কিন্তু সিজদার কারণে কপালে যে দাগ পড়ে তা শুধু ফর্‌য নামায আদায়কারীদের কপালেও দেখা যায়। চামড়া নরম হওয়ার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। অথচ যারা প্রচুর নামায পড়ে এবং দীর্ঘ সিজদা করে তাদের অনেকের কপালে এ চিহ্ন দেখা যায় না। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

বড় সোনা মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আমের শহর খ্যাত মালদহ জেলায় অবস্থিত বাংলার এক সময়ের ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক নগরী। এই ঐতিহাসিক নগরীটি ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। লক্ষণাবতী বা লখনৌতি নামেও পরিচিত এই প্রাচীন দুর্গনগরীর অধিকাংশ অংশই আজকের ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ জেলায় অবস্থিত, যদিও কিছু অংশ বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত। ঐতিহাসিক এই নগরী গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল, রাজমহল থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মালদা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে। তবে বর্তমানে গঙ্গা নদীর প্রবাহ গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় বৌদ্ধ যুগে পাল বংশের রাজত্বকালে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। তারপর ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে (৬০৫ বঙ্গাব্দ), মুসলিম শাসকরা গৌড় অধিকার করবার পরেও গৌড়েই বাংলার রাজধানী থেকে যায়। অতঃপর ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে (৭৫৭ বঙ্গাব্দ) বাংলার রাজধানী কিছুদিনের জন্য পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হলেও ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে (৮৬০ বঙ্গাব্দে) আবার রাজধানী ফিরে আসে গৌড়ে এবং গৌড়ের নামকরণ হয় জান্নাতাবাদ। অনুমান করা হয় ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ঐতিহাসিক স্থানের অন্যতম আকর্ষণ হলো বড় সোনা মসজিদ, যা বারো দুয়ারী মসজিদ নামেও পরিচিত। মসজিদটি গৌড়ে অবস্থিত পুরনো স্থাপত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। মসজিদটি নির্মাণ করা হয় হোসেন-শাহ স্থাপত্য রীতিতে। স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন এই মসজিদের নির্মাণকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে স্থাপত্যশৈলীর মিল এবং মসজিদের কাছাকাছি পাওয়া শিলালিপি থেকে ধারণা করা হয় যে বড় সোনা মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল। ইটের তৈরি এই বিশাল মসজিদটিতে মোট এগারোটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, যদিও এর নাম বারো দুয়ারী। মসজিদের ১১টি প্রবেশপথ বরাবর এগারোটি মিহরাব নির্মিত হয়েছিল। কালের আবর্তে, সবই এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। মসজিদের দেওয়ালটি ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি এবং পাথরের আস্তরণ দিয়ে সজ্জিত। এই মসজিদটি একটি আয়তাকার আকৃতির, যার চার কোণে অষ্টভুজ বুরুজ রয়েছে। মসজিদটি তিন কাতারবিশিষ্ট-এর দৈর্ঘ্য ৫১.২ মিটার এবং প্রস্থ ২৩.১৫ মিটার। মসজিদের সম্মুখভাগে উত্তর-দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিস্তৃত বারান্দা। প্রার্থনাকক্ষ এবং বারান্দার ওপর মোট ৪৪টি গম্বুজ ছিল এই মসজিদে। দুঃখজনকভাবে, বর্তমানে কেবল বারান্দার উপরের এবং মসজিদের দেওয়ালের উপরের গম্বুজগুলো টিকে আছে। বাকি গম্বুজগুলো সময়ের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে একসময় একটি রাজকীয় গ্যালারি ছিল, যার উপরে চারটি গম্বুজ ছিল। অন্যান্য মসজিদের মতো, গ্যালারির প্রবেশপথগুলো বাইরের দিকে ছিল। মসজিদটির অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের হাজারো পর্যটক ভিড় করে থাকেন পুরনো আমলের ঐতিহাসিক এই মসজিদটি দেখার জন্য। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (মে-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪ : ০৪	০৫ : ২৪	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৮
০২	০৪ : ০৩	০৫ : ২৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৯
০৩	০৪ : ০২	০৫ : ২২	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৮	০৭ : ৫০
০৪	০৪ : ০১	০৫ : ২২	১১ : ৫৬	০৩ : ২১	০৬ : ২৯	০৭ : ৫০
০৫	০৪ : ০০	০৫ : ২১	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ২৯	০৭ : ৫১
০৬	০৩ : ৫৯	০৫ : ২১	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩০	০৭ : ৫২
০৭	০৩ : ৫৮	০৫ : ২০	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩০	০৭ : ৫২
০৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ১৯	১১ : ৫৫	০৩ : ২০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫৩
০৯	০৩ : ৫৭	০৫ : ১৯	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩১	০৭ : ৫৪
১০	০৩ : ৫৬	০৫ : ১৮	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩২	০৭ : ৫৪
১১	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৮	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩২	০৭ : ৫৫
১২	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৭	১১ : ৫৫	০৩ : ১৯	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৬
১৩	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৭	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৬
১৪	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৬	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৭
১৫	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৬	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৮
১৬	০৩ : ৫২	০৫ : ১৫	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৮
১৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৫	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৯
১৮	০৩ : ৫১	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৮	০৬ : ৩৫	০৮ : ০০
১৯	০৩ : ৫০	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৬	০৮ : ০০
২০	০৩ : ৫০	০৫ : ১৪	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৬	০৮ : ০১
২১	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৩	১১ : ৫৫	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৭	০৮ : ০২
২২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৩	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৭	০৮ : ০২
২৩	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৩	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৮	০৮ : ০৩
২৪	০৩ : ৪৮	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৮	০৮ : ০৪
২৫	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৯	০৮ : ০৪
২৬	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৭	০৬ : ৩৯	০৮ : ০৫
২৭	০৩ : ৪৭	০৫ : ১২	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪০	০৮ : ০৫
২৮	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪০	০৮ : ০৬
২৯	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪১	০৮ : ০৭
৩০	০৩ : ৪৬	০৫ : ১১	১১ : ৫৬	০৩ : ১৬	০৬ : ৪১	০৮ : ০৭
৩১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৮

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

IATA MEMBER
ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত